BANGLAKITAB.com

ইজতেমার পূর্বে মিয়াজী মেহরাব সাহেবের ''মুযাকারা''

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ভাই, ইজতেমা এটা কোন নতুন নিয়ম নয় বরং পুরানো উছুল, এক ছিল উম্মত দ্বীনের তাকাজা পুরা করার জন্য একত্রিত হত, ঐ সময় উম্মত বিস্তার লাভ করতে ছিল ও চমকিতেছিল, দিল হকের দিকে ধাবিত হচ্ছিল, তখন উম্মতকে একত্রিত করার জন্য একটা বিশেষ এলান ছিল - আস্‌সালাতুল জামিআ। এলানের মধ্যে এমন এক আকর্ষণ ছিল যে প্রত্যেক স্বীয় কাজকাম ছেড়ে মসজিদে জমা হত এবং নিজেই নিজেকে তাশকীল করে আসত এ কথার উপর যে দ্বীনের যে কোন তাকাজা আসুক না কেন, তার জন্য জানমাল দিয়ে তা পুরা করব। এ নিয়তে আসত না যে ২/১ ঘন্টা কথা শুনে ফেরত যাব বরং জ্ঞান দেয়ার প্রয়োজন হলে জ্ঞানটাও দিয়ে দিব।

ঐ সময় পরিবেশ এমন ছিল যে, যদি কাউকে একথা জিজ্ঞাসা করা হত - "আপনি যেতে পারবেন কি?" তা হলে সে অবমাননা মনে করত এবং গোস্যা হয়ে বলত - আমি কি মুমিন নই। হুজুর (সঃ) এর উম্মত নই। আমাদের উদ্দেশ্য ত এটাই। তাকাজা পুরা হওয়ার পরে যারা বাকী থাকত তাদেরকে বলা হত - এখন ত তাকাজা পুরা হয়ে গিয়েছে; অন্য এলানের জন্য অপেক্ষায় থাকুন। এখন তো আপনার জিম্মায় দুইটি কাজ - যাঁরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় বের হয়ে গিয়েছেন তাঁদের ঘরের খবর লওয়া। আসবাবী কাম হিসাবে নিজের গৃহস্থালী কাজ কারবারকে সামাল দেওয়া।

যখন উম্মত এ কাজকে উদ্দেশ্য বানিয়ে চলছিল। তখন দিল হক্কের দিকে পাল্টে যাচ্ছিল এবং আল্লাহতায়ালা মদদ উম্মতের সঙ্গে ছিল।

ভাই, এ স্থানে আমরা অনেক বড় মাকসাদ নিয়ে জমা হয়েছি। আল্লাহরাব্বুল ইজ্জাত আমাদেরকে হেদায়েত ফরমাবেন। হেদায়েত এমন এক মহান দৌলত যাকে চাওয়া হচ্ছে ফরজ নামাজের প্রতি রাকাতে এবং সুন্নত ও নফলের প্রতি রাকাতে - ইহাদিনাশ্‌ সিরাতাল মুস্তাকিম - এর মাধ্যমে (উলাইকাল্লাযীনা আন অ'মাল্লাহু) নাবিয়্যিন, সিদ্দিকীন, শুহাদা, সালেহীন আল্লাহতায়ালা এই চার শ্রেণির লোকদের এ মেহনতের দ্বারা পুরস্কৃত করেছেন। যাঁরা বে-গরজ হয়ে মানুষের কল্যাণের ফিকির নিয়ে ঘোরাফেরা করেছেন।

যাঁরা এখানে আসছেন তাঁরা কোন রেডিওর ঘোষণায় নয়, বরং আপনাদের চেষ্টা ও মেহনতের বরকতে এ মাজমা যা একত্রিত হচ্ছে তা অনেক মেহনতের বদৌলতে। আল্লার বান্দারা এখানে কেউ দুনিয়ার লাভের জন্য আসছেন না। বরং আল্লাহর মহব্বত ও তাঁর রাসুলের মহব্বত নিয়ে আসছেন। এ মাজমা বড় দামী মাজমা'।

প্রত্যেক লোকই নিজেকে ইজতেমার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে করবে, কেহ যেন এ থেকে সম্পর্কহীন না থাকে। তিনজন তিনজন করে জামাত বানিয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে মুলাকাত (দেখা সাক্ষাৎ) ঘরের বড়দেরকে ডেকে জিম্মাদারী বুঝাবে যে, প্রত্যেক মুসলমান দ্বীনের জিম্মাদার দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আর এ জিম্মাদারী আদায় করার এক শিরোনাম হল ইজতেমা। দ্বীনের জন্য ইমানদার ব্যক্তিবর্গ যদি একত্রিত হয়, তাহলে আল্লাহর সাহায্য আসে এবং সে জায়গায় লোকদের জন্য আল্লাহতায়ালা মঙ্গল (খাইর) এর দরজা খুলে দেন ও মন্দ ও ফেতনার দরজা বন্ধ করে দেন। আর ইজতমার মাধ্যমে লোকদের ভিতরে হক কবুল করার যোগ্যতা পয়দা হয়।

আপনাদের ঘরের বালেগ পুরুষ / মহিলা প্রত্যেকে যেন আল্লাহতায়ালার ফরজ হুকুম পাঁচওয়াক্ত নামাজের ইহতেমাম করে। আর কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করে।

যে পড়তে জানে না সে যেন শিখতে শুরু করে। আর তালীম প্রত্যহ ঘরে ও মসজিদে করে। মাসয়ালা সমূহ উলামা কেরাম থেকে জেনে নেবে। সকাল বিকাল আল্লাহর নাম নেবে এবং প্রত্যেক ঘর থেকে একজন বালেগ পুরুষকে ৪ মাসের জন্য বের করে।

প্রত্যেক পুরুষ-মহিলা নিজের ইজতেমা মনে করবে এবং আল্লাহর দরবারে এর জন্য দোআ করবে। ফলে, এ পবিত্র আমলের প্রভাব ইজতেমার উপর পড়বে, যদিও শারিরীকভাবে উপস্থিত নাও হতে পারে।

এ আমলের প্রভাব ঋতুর মত, ঋতুর মধ্যে দুটো বিষয় রয়েছে - ১) কাউকে ভয় করে না, কারও আদব করে না। বরং সবাইকে প্রভাবান্বিত করে। যেমন - গ্রীষ্মকালের গরম, কোন সৈনিককে ভয় করে না আর কোন মুহাদ্দিসকেও আদব করে না। ঢাকা শহরের যত পুরুষ-মহিলা এ সমস্ত আমলে জড়িত হবে, ততই এর প্রভাব ইজতেমায় পড়বে এবং ইজতেমায় আগমনকারীদের উদ্দেশ্য ছিল

আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে ও হক্ব কবুল করার যোগ্যতা পাবে।

আমাদের মাওলানা হজরত ইউসুফ সাহেব (রহঃ) বলতেন, দাওয়াতের মাধ্যমে পবিত্র আমলের দ্বারা ভাল পরিবেশ বনবে, তখন ফাশিক-ফাজির ওলিউল্লাহ বনবে। যদি দাওয়াতের আমল না হয় তবে ভাল পরিবেশ বনবে না; তখন ওলিউল্লাহর সন্তান ফাশিক - ফাজির বনবে। এ পবিত্র আমল যখন উম্মতের মধ্যে জিন্দা ছিল (চালু ছিল), তখন তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, সবর ইত্যাদিও জিন্দা হত। আর উম্মতের সমস্ত চিন্তা ফিকির এ কামের জন্য লাগানো ছিল তখন আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার চিন্তা-পেরেশানী থেকে তাদেরকে মুক্তি দিয়েছিলেন ও যখন প্রত্যেক উম্মতের জীবনের উদ্দেশ্য দ্বীনকে জিন্দা করার ছিল আর জানমাল দ্বীনের জন্য খরচ করা হত তখন উম্মত চমকাচ্ছিল আর দ্বীন, দুনিয়ার মধ্যে প্রসার লাভ করেছিল এবং অমুসলিমগণ প্রভাবান্বিত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছিল আর মুসলমানেরা উন্নতির শেষ প্রান্তে পৌঁছে ছিলেন। আর পরিবেশ এমনভাবে গঠিত হচ্ছিল যে কোন ঈমানদার নামাজ ছাড়বে এটা কল্পনাও হতো না, তদ্রূপ কোন ঈমানদার হারাম কামাইয়ের রাস্তা অবলম্বন করবে তাও কল্পনার বাইরে ছিল।

যখন এ উম্মত দাওয়াতওয়ালা আমলকে ছেড়ে নিজের পেশাকে জীবনের মাকসাদ (উদ্দেশ্য) বানাল অর্থাৎ ব্যবসায়ীরা ব্যবসাকে, কৃষক তার চাষকে, মালদার তার মালকে মাকসাদ বানাল তখন থেকে উম্মতের অবনতি শুরু হল।

মুসলমান বদদ্বীনের তারিকার প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠল এবং নাবী (সাঃ) এর তারীকার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতে লাগল। এমন কি ইসলামের উপর থাকা, ইসলাম অনুযায়ী জীবন কাটান মুশকিল হয়ে দাঁড়াল, আর ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। খোদার মদদও উম্মত থেকে হটে গেল।

এখন যদি ইজতেমার পূর্বে মসজিদওয়ারী জামাত বানায়ে অল্প অল্প করে মেহনত করা হয় তাহলে এ ইজতেমা সমগ্র দুনিয়ায় হেদায়েতর বিস্তৃতি লাভ ও জামাত পাঠানোর জারীয়া (মাধ্যম) বা উপলক্ষ্য হতে পারে। আর প্রত্যেক মসজিদে মসজিদে নববীর নমূনা হতে পারে। ২৪ ঘন্টা আমলের দ্বারা মসজিদ আবাদ ছিল। ঈমানের মজলিস, তালিমের হালকা, জিকির-তেলাওয়াতের পরিবেশ, রাতের তাহাজ্জুদ, দোআর হইতে মাফ হত। আপনারা ও আমরা এ তরতীবে মেহনত করতে থাকব। এতে যত লোক বিশ্বাস করবে, আমল করতে থাকবে

BANGLAKITAB.com

এবং আমলের যতটুকু খাইর অজুদে আসবে প্রত্যেক মেহনতকারীর তার আজর ও বদল মিলবে।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

- মদীনা মুনাওয়ারা

২৮-০৫-৬৫

বেরাদারেম হাজী আঃওহাব সাহেব,

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লা জাল্লা শানুহু যখনই তাঁর বান্দাদের উপর মেহেরবানী করতে চাইতেন তখনই আম্বিরা (আঃ) প্রেরণ করে মানুষকে হেদায়েত ও মারেফাতের নেয়ামত দান করতেন। আমাদের প্রিয় নবী (দঃ) এর পরে কোন নতুন নবী আসবেন না। সেহেতু মানুষ হেদায়তের আলো কি ভাবে পাবে? এজন্য এই জিম্মাদারী এই উম্মতের উপর অর্পণ করা হয়েছে। নবওতের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কা'রে নবুওত বন্ধ করা হয় নাই। এখন প্রিয় নবী (সঃ) এর কাজ নিয়ে চলা আমাদের জিম্মাদারী। এর কারণ হল হুজুর (সাঃ) কিয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক মানব ও জীনের নবী। হুজুর (সাঃ) তো দুনিয়া থেকে তাশরীফ নিয়ে গেছেন। কিন্তু আগন্তুক মানুষদেরকে বলে দেবে যে দুনিয়াতে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি? এটা আপনার আমার জিম্মাদারী উম্মত যতদিন এই কাজকে জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে করছিল ততদিন এই উম্মতের মধ্যে দ্বীন টিকে ছিল (বিদ্যমান ছিল)। উম্মতের দ্বীনী জীবন দেখে অমুসলমান কওম সমূহ দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করছিল। যখন উম্মতই এই কাজকে ছেড়েছে, অমুসলমান কওম কি দ্বীনের মধ্যে আসবে; স্বয়ং মুসলমানদের জীবন থেকে দ্বীন বের হওয়া শুরু হয়ে গেছে। আজ জামাতের নকল হারকাতের দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, কত মুসলমান আজ কলেমাকে ভুলে বসে আছে। এই মেহনত জারি করে পুনরায় আল্লাহ জাল্লা শানুহু তাঁর বান্দাগণের উপর মেহেরবানী করেছেন। আল্লাহপাকের এই এহসানকে স্বীকার করে এই মেহনতকে নিজের কাজ মনে করে করা আর নিজ জীবনের মাকসাদ বানানো চাই। কারণ খাওয়া, কামানো, বিবিবাচ্চা পালন করা ইত্যাদি হল জীবনের জরুরত (প্রয়োজনীয় উপকরণ)। নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত অর্থাৎ ইবাদাতসমূহ ফারায়েজে জিন্দেগী। আর দাওয়াতের মোবারক মেহনত হলো মাকসাদে জিন্দেগী। মাকসাদের জন্য জরুরতকে কুরবানী করা

যায়। জরুরতের জন্য মাকসাদকে কখনও কুরবানী করা যায় না। এজন্য এই কাজকে কুরবানীর সাথে করা চাই। গাশতের এহতেমাম করা, চাই এতে দোকানে তালা লাগাতে হয় লাগাবে অথবা চাকরি থেকে ছুটি নিতে হয়, নিবে। কারণ গাশত মাকসাদে জিন্দেগী, আর দোকান, চাকরি, কৃষি, ব্যবসা জরুরিয়াতে জিন্দেগী। যখন মাকসাদে জিন্দেগী পুরা করব তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু আমার জরুরত সহজভাবে পুরা করে দিবেন। একই ভাবে সব আমল অর্থাৎ তালীম, গাশত, মাসে তিন দিন কুরবানীর সাথে করলে জীবনের পরিবর্তন আসবে। এই মুবারক মেহনতের জরিয়ায় দ্বীন আমাদের জীবনে আসবে এবং অনেক মানুষের জীবনেও আসবে।

ইবাদাত দ্বারা হেদায়েত সম্প্রসারিত হয় না। হেদায়েত দাওয়াতের দ্বারা প্রসার লাভ করে। জীবন থেকে দাওয়াত বের হয়ে গেলে ইবাদাত বের হতে থাকে। আমার নামাজদ্বারা কোনও শরাবীর শরাব ছুটবে না। কোনও বেনামাজী নামাজী হবে না। তাহলে কোনও কাফেরের কুফরী কিভাবে ছুটবে? এটাতো দাওয়াতের মেহনত দ্বারা হবে। শরাবীর শরাব ছুটবে, বেনামাজী নামাজী হবে, কাফেরের কুফর ছুটে যাবে। বরং সব বাতেল যে ছুটে যাবে তা দাওয়াত দ্বারা ছুটে যাবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু যখনই কোন বাতেলকে ভেঙেছেন, তা দাওয়াতের মাধ্যমেই ভেঙেছেন। ফেরাউনের বাতেল দাওয়াত দ্বারা ভেঙ্গেছে, নমরূদের বিদ্রোহ দাওয়াতের দ্বারা খতম হয়েছে; আবু জেহেলের জেহালত দাওয়াতের দ্বারা খতম হয়েছে। মোটকথা দাওয়াত আম্বীয়া (আঃ) গণের হাতিয়ার ছিল যা এই উম্মতকে দেওয়া হয়েছে। যতদিন এই উম্মত দাওয়াতের কাজ করছিল, এই হাতিয়ার ব্যবহার করছিল, ততদিন দুনিয়াতে তারা বিজয়ী ছিল, সব বাতেল ভেঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। যখনই উম্মত এই হাতিয়ার কে রেখেদিল তখনই দুনিয়া বাতেলে পরিপূর্ণ হল এবং মুসলমানদের জীবন বাতেলের নকশার উপর আসল। মুসলমান ঘরের মধ্যে বাতেল ঢুকে পড়ল, মুসলমানদের মোয়াশারাত, ব্যবসা, আখলাক চরিত্র, মোয়ামালাত অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে বাতেলের প্রচলন হয়ে গেল যখনই আমরা হকের মেহনত ছেড়েছি তখনই দুনিয়ার সকল স্থানে বাতেল দৃষ্টি গোচর হতে লাগল এবং তারা শক্তি অর্জন করতে লাগল।

যখন দাওয়াত দুনিয়াতে শুরু করা হয় তখন সর্বপ্রথম আল্লাজাল্লা শানুহু দায়ীর ভিতর থেকে বাতেলকে বের করে দেন। যখন এ সকল মানুষের আমল

BANGLAKITAB.com

তৈরী হয়ে যায়, যাদের ভিতর থেকে বাতেল বের হয়ে গেছে, তখন এদেরকে জরিয়া বানিয়ে আল্লাহ জাল্লা শানুহু বাতেলকে ধ্বংস করা শুরু করেন। যেমন হুযুরের (সাঃ) যামানায় যখন ৩১৩ জন সাহাবা (রাঃ) তৈরি হলেন যাদের অন্তরের মধ্য থেকে বাতেল বের হয়ে গিয়েছিল তখন তাদের জারিয়া বানিয়ে আল্লাহ জাল্লা শানুহু মক্কার কাফেরদের বাতেলকে ধ্বংস করেছিলেন।

দাওয়াতের দ্বারা দোআ কবুল হয় কারণ দাওয়াত নবীদের হাতিয়ার ছিল। পূর্বেকার নবীদের অনুসারীদের দোআর হুকুম ছিল না। তাদের যখন কোনও সমস্যা সামনে আসত তখন নিজ জমানার নবীর নিকট যেতেন। নবীর নিকট দরখাস্ত করতেন, হে নবী (আঃ) আল্লাহকে বলেন যেন আমাদের অমুক অমুক প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। সরাসরি আল্লাহর নিকট চাইতে পারতেন না। যেমন বনী ইস্রাইল মুসা (আঃ) কে বলল, আল্লাহর কাছে দোআ করেন যেন তিনি আমাদের পিয়াজ-রসুন দেন' অর্থাৎ বনি ইস্রাইল সরাসরি চাইতে পারত না। এটাত আমাদের উপর বিশেষ নেয়ামত যে তিনি কুরআনে পাকে ফরমান, 'তোমরা চাও আমি দিয়ে দিব।' যেহেতু এই উম্মতকে নবীওয়ালা কাজ দেওয়া হয়েছে সেহেতু এই উম্মতকে নবীওয়ালা হাতিয়ারও দেওয়া হয়েছে। দোআ নবীদের হাতিয়ার ছিল। সুতরাং যখন আমরা দাওয়াতের কাজ করব তখন আমাদের দোআ কবুল হবে। যেমন যে সৈন্য সীমান্ত রক্ষা করে তাকে হাতিয়ার দেওয়া হয়। কিন্তু যদি সৈনিক সীমান্ত রক্ষার কাজ না করে আর সীমান্ত ছেড়ে পলায়ন করে তাহলে সর্বাগ্রে তার কাছ থেকে হাতিয়ার ছিনিয়ে নেওয়া হয়। অনুরূপভাবে হুজুর (সাঃ) ফরমান, 'জালেমকে জুলুম থেকে রুখতে থাক এবং তাকে সত্যের দিকে টেনে আনতে থাক, 'আমর বিল মারূফ নাহী আনিল মুনকার' করতে থাক নতুবা তোমাদের কলবগুলো না ফারমানদের মতো হয়ে যাবে এবং বনি ইস্রাইলের মতো তোমাদের উপর অভিশাপ অবতীর্ণ হবে।

দোআ এবং আল্লাহর মদদ এসব কিছু দাওয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যখন আমরা দাওয়াতের মেহনত করব তখন আল্লাহ জাল্লা শানুহু বনী ইস্রাইলের নবীদের মতো আমাদের দোআ কবুল করবেন এবং আমাদের কার্যসমূহ দোআর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সম্পন্ন হবে। এরপর আমরা জিনিষের দ্বারা পালিত হব না বরং আল্লাহতায়ালা দোআর মাধ্যমে প্রতিপালন করবেন। দুনিয়ার জিনিষ দ্বারা অমুসলমানরা পালিত হয়। মুসলমান আল্লাহ কর্তৃক পালিত হয়। আল্লাহর

কাছ থেকে নেওয়ার মাধ্যম হল দোআ। দোআর কবুলিয়াতের জন্য দাওয়াত শর্ত।

সুতরাং এই কাজের উপকারিতা শুনে শেষ করা যাবে না। আমরা করতে থাকব ও আল্লাহপাক এর ফায়দা খুলে দিতে থাকবেন।

সব চাইতে বড় ফায়দা হলো আল্লাহপাক এই মেহনতের মাধ্যমে এই উম্মতকে উন্নতশির ও হাস্যোজ্জ্বল করবেন। এটা ছাড়া উম্মতের বর্তমান সমস্যা থেকে বের হওয়ার কোনও মাধ্যম নাই। এরা নবী করিম (সাঃ) এর উম্মত। যদি আমাদের সামান্য মেহনত ও কুরবানী দ্বারা এদের জীবনে দ্বীন এসে যায় আল্লাহপাক এদেরকে আখেরাতের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেন তবে জনাব রসুলে করিম (সাঃ) কি খুশি হবেন না? বরং এক রেওয়ায়েতের সারমর্ম হলো যে প্রত্যেক জান্নাতীকে হুজুর (সাঃ) নিজের মোবারক হাত দ্বারা আবে কাওসার পান করাবেন। কিন্তু ঐ জান্নাতী যে অন্যের জান্নাতে যাওয়ার জারিয়া হবে তাকে নবী করিম (সাঃ) সর্বপ্রথম নিজ সিনার সঙ্গে লাগাবেন এবং বলবেন আমার উম্মত আমার ফিকিরের সঙ্গে দুনিয়াতে ছিল। আখেরাতে এটা আমাদের জন্য কত বড় সম্মানের কারণ হবে যে সর্দারে আম্বিয়া মাহবুবে খোদা, আহমদ মুস্তাফা (সাঃ) আমাকে তাঁর সিনা মোবারকে লাগাবেন। এই সম্মান এই মেহনতের বুনিয়াদের কারণে পাওয়া যাবে। ইবাদতের বুনিয়াদে আবে কাওসার পাওয়া যাবে। দাওয়াতের বুনিয়াদে নবী করিম (সাঃ) এর সিনার সান্নিধ্যে পাওয়া যাবে।

আল্লাহ জাল্লা শানুহু সব উম্মতকে এই আলি মেহনতের জন্য কবুল করেন এবং করতে করতে মরার এবং মরতে মরতে করার তৌফিক দান করেন।

আমীন। সুম্মা আমীন। ইয়া রাব্বাল আ'লামিন।

মিয়াজী মেহরাব সাহেবের বয়ান

রবিবার ৩রা মার্চ, ১৯১৬ বাদ ফজর (টঙ্গী ইজতেমা)

এই সময় তবলীগের নামে এক মেহনত হচ্ছে যার মাকসাদ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এর অনেক বড় গরজ আছে এবং এর মাকসাদ কোন সাধারণ বিষয় নয়। আখেরাতের অবস্থার মধ্যে সবাইকে একদিন না একদিন যেতে হবেই;

BANGLAKITAB.com

কেউ চির জীবন থাকতে দুনিয়াতে পারবে না। আল্লাহ রাব্বুল ইযাযাত এই দুনিয়ার ব্যাপারে এক নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন যা হতে কারোর নিস্তার নেই। এর মধ্যে প্রথম নিয়ম হল - যে মানুষ এই দুনিয়ার মধ্যে এসেছে তাকে অবশ্যই একদিন এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া হতে চলে যেতে হবে। এরই নাম মৃত্যু। মৃত্যু হল এই নকল ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া হতে আসল এবং স্থায়ী জায়গায় যাওয়া। এই স্থান পরিবর্তনের নাম মৃত্যু।

সোওয়া লাখের কাছাকাছি আম্বিয়া (আঃ) দুনিয়াতে এসেছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল ইযাযাত তাদের নবুওতের জন্য বাছাই করেছিলেন। আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকার দায়িত্ব তাদের উপর ন্যস্ত ছিল; কিন্তু আজ তাঁরা কেউ আর এই দুনিয়াতে বাকী নেই। সোওয়া লাখের কাছাকাছি সাহাবা (রাঃ) ছিলেন। তাঁরা হুজুর (সাঃ) এর সঙ্গ দিয়েছিলেন। মানুষকে আল্লাহর দিকে ডেকে ছিলেন। তাঁদের আজ কি কেউ মওজুদ আছে? না জানি আল্লাহতায়ালার কত শত ওলি আল্লাহ এই দুনিয়াতে এসেছিলেন যাঁদের আল্লাহতায়ালার সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তাঁদের কেউ কি আজ বাকী আছে? কত শত আল্লাহর নাফরমান বান্দা এই দুনিয়াতে এসেছিল। তারা আল্লাহতায়ালার নাফরমানির দিকে মানুষকে ডাকত। তাদের কেউ আর এই আলমে বাকী নেই। সুতরাং আল্লাহতায়ালা সকল মানুষের জন্য অকাট্য নিয়ম করেছেন যে, যেই এই দুনিয়াতে পয়দা হবে তাকে এই আসমান জমিনের নকশা হতে, এই অস্থায়ী দুনিয়া হতে চিরস্থায়ী আখেরাতে যেতেই হবে।

দ্বিতীয় আর এক মৌলিক ও অকাট্য নিয়ম আল্লাহ সকল মানুষের জন্য বানিয়েছেন যে, যে সময় তাকে এই দুনিয়া ছাড়তে হবে, অর্থাৎ মৃত্যুর সময় তাকে নিঃস্ব অবস্থায় চলে যেতে হবে। চাই তার কাছে যত মাল দৌলত, সোনা, হীরা, মুলক থাকুক না কেন, সে কিছুই সঙ্গে নিতে পারবে না। তৃতীয় যে অকাট্য নিয়ম আল্লাহতায়ালা মানুষের জন্য বানিয়েছেন তা হল - যে আমলই সে করুক না কেন, চাই সে ভাল করুক অথবা খারাপ করুক সবই তার সঙ্গে যাবে। কিছু ফেলে যেতে পারবে না। মানুষের এই স্বাধীতা আল্লাহতায়ালা খর্ব করেছেন যে, সে তার মনোমত আমল সমূহ নিয়ে যেতে চাইবে অর্থাৎ ভালোগুলো নিয়ে যাবে আর মন্দগুলো রেখে যাবে। আমলের হেফাযতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল ইযাযাত এক গায়েবী ব্যবস্থা চালু রেখেছেন। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে সদাসর্বদা দুইজন ফেরেশতা অবস্থা করেন। পাহাড়ে, জঙ্গলে, গুহায়, গর্তে রাতে দিনে,

নির্জনে-জনসমক্ষে যেখানেই মানুষ যে আমলই করে, ফেরেশতাদ্বয় সঙ্গে সঙ্গে তা লিখে নেন, কোন কিছু বাদ দেন না। এই তিন নিয়মের খবর আল্লাহতায়ালা বড় বড় আসমানী কেতাবের মধ্যে দিয়েছেন। যবুর - হযরত দাউদ (আঃ) এর উপর, তাওরাত - মুসা (আঃ) এর উপর, ইনজিল হযরত ঈসা (আঃ) এর উপর, নাযিল করে এই তিন নিয়মের কথা জানিয়েছেন। এই তিন নিয়ম এতই অটল যে সকলকে অবশ্যই এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতে হবে। আখেরাতের ব্যাপারে আল্লাহতায়ালা তিন দস্তুর নিয়ম রেখেছেন। এখান হতে কারোর কোন নিস্তার নেই। প্রথমটি হল এই যে, যে ব্যক্তি একবার মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করেছে সে আর কোন দিন মৃত্যুবরণ করবে না, চাই সে ভাল আমল করুক আর মন্দ আমল করে যাক। দ্বিতীয় দস্তুর নিয়ম হল, যে ব্যক্তি একবার মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করে আখেরাতে পৌঁছে গেছে তাকে আর কোন দিন দুনিয়াতে ফেরত পাঠান হবে না। চাই সে স্বাধীনভাবে কারবার, চাকরি, হুকুমত করে এটা নিয়মের মধ্যেই নেই যে, কেউ একবার মৃত্যু বরণ করলে তাকে আবার দুনিয়াতে ফেরত পাঠাবেন। তৃতীয় নিয়ম হলো এই যে যে কোন ব্যক্তি আল্লাহতায়ালাকে চিনে নিল। তাকে ভয় করল, তাঁর হুকুমমত জীবনযাপন করল, হুজুর (সাঃ) এর তরিকার পাবন্দ হয়ে, মুকাইয়েদ হয়ে জীবন কাটাল, মানুষকে আল্লাহতায়ালার দিকে ডাকতে ডাকতে মৃত্যু বরণ করল তার জন্য আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর সময় হতেই যে নেয়ামত সমূহের দরজা খুলবেন তা আর কখনও বন্ধ হবে না। অপর দিকে কোন লোক আল্লাহকে চিনল না, হুজুর (সাঃ) এর তারিকার অধীন তার জীবনকে গড়ল না, স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করল, হতে পারে মৃত্যু পর্যন্ত সে এই রকম ধোকার মধ্যে জীবন কাটাল, তবে মৃত্যুর সময় তার উপর আল্লাহতায়ালার যে বালা এবং মুসিবতের দরজা খুলবে তা সব সময় খোলাই থাকবে, কখনও বন্ধ হবে না। এটা কোন তোতা ময়নার গল্প নয়; সত্য কথা যার মধ্য দিয়ে সবাইকে অতিবাহিত হতেই হবে।

আল্লাহতায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা মানুষের জন্য হুজুর (সাঃ) কে এক সহজ, আশাবাদী তরিকা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি এই তরিকার পাবন্দ হয়ে, মুক্কাইয়েদ হয়ে জীবন যাপন করবে মৃত্যুর সময় হতেই তার জন্য আল্লাহতায়ালার নেয়ামত সমূহের যে দরজা খুলবে তা আর বন্ধ হবে না। (যদি) আল্লাহতায়ালার কোন মূর্খ বান্দা অথবা বান্দি স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে,

BANGLAKITAB.com

আল্লাহতায়ালার হুকুমের পাবন্দি না করে, মুকাইয়েদ না হয়ে যায়, হুজুর (সাঃ) এর তরিকা হতে স্বাধীন হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন যাপন করে, তবে মৃত্যুর সময় হতেই যে খারাবীর দরজা খুলবে তা আর কখনও বন্ধ হবে না।

মৃত্যুর পর এমন কাঠন এবং অসম্ভব সমস্যা দেখা দিবে যা দেখার পর বড় বড় নাফরমান বান্দা যারা নিজেদের আল্লাহ বলে দাবী করেছিল তাদের মধ্যে এমন ইমান আসবে যা আজ সলেহীনদের মধ্যেও নেই। কিন্তু এই ঈমান সেই সময় আল্লাহতায়ালার আযাব হতে তাদের মুক্তি দিতে সরিষা পরিমাণও কাজে লাগবে না। মৃত্যুর পূর্বে যে আল্লাহকে ভয় করবে ঈমান আনবে, হুজুরের তারিকার পাবন্দ হয়ে মুকাইয়েদ হয়ে জীবন যাপন করবে সে সফলকাম হবে। আর যে আল্লাহকে ভয় না করে স্বাধীন ভাবে জীবনযাপন করবে তার মৃত্যুর পর এও কঠিন আর এত ভয়াবহ সমস্যা হবে যে, সে রক্তকান্না কাঁদবে কিন্তু কোন কাজে আসবে না।

আজ সব জায়গায় এমন এক অবস্থা হয়েছে যে, যে যেখানে আছে, চাই শহরে থাকুক বা গ্রামে থাকুক, যে কোন ব্যস্ততায় থাকুক, যেমন, ব্যবসা, চাকরি, কৃষি, সর্বক্ষেত্রে তার দেমাগের ব্যবহার, চোখের ব্যবহার, হাতের ধরা, পায়ের চলা প্রভৃতি ঐ (দেমাগের) লাইনে হয়ে থাকে। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ চিন্তায় থাকে। এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে যখন সে ঘরে ফেরে তখন বালেগ ছেলে অথবা বালেগ মেয়ের প্রতি যখন দৃষ্টি পড়ে তখন ফিকির পয়দা হয় যে, আমার ছেলে বিয়ের উপযুক্ত, কোন ভাল মেয়ে অথবা ছেলে পাওয়া যায়, কোন ভাল শরীফ খানদান পাওয়া যায়। তার বিবি তার সামনে ঘরের কোন তাকাথা রাখে সেটাও তাকে প্রভাবিত করে। এভাবে অন্যান্য যে কোন সমস্যা থাকে (সে সমস্যা তাকে) চিন্তিত করে ফেলে। এরপর সে বিবি বাচ্চার সঙ্গে হেসে খেলে সে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে সে দেমাগী নিজাম বা প্ল্যান বানায় যে অমুক সমস্যার এই সমাধান অমুক সমস্যার অমুক সমাধান। এই ঈমানওয়ালা আল্লার বড়ত্বের কথা চিন্তা করে না, আল্লার কুদরতের কথা চিন্তা করে না, জান্নাত - জাহান্নামের কথাও চিন্তাভাবনা করে না। এভাবে সে রাত্রে ঘুমায় আর এই সব চিন্তা তার অন্তরে আসর করতে থাকে। এই কথাগুলো বড় হযরতজী ইলিয়াস (রাঃ) আমাদের ঘন্টার পর ঘন্টা বুঝতেন যেমন বাপ তার ছেলেকে লাভলোকসানের ব্যাপারে বুঝায়, শফকত ও মহব্বতের সাথে বুঝিয়ে দ্বীনের মেহনত এর জন্য আমাদেরকে

তৈরী করতেন।

প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজ নিজ মাশগুলাত ছেড়ে তিন চিল্লার জন্য জামাত বানিয়ে বানিয়ে আল্লার রাস্তায় বের হয় এবং পুরানোদের সলামাশওয়ারা এবং হেদায়ত নিয়ে যতটুকু আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত তৌফিক দেন, নিজ বাসস্থান ছেড়ে ততদূরে চলে যায়। কোন বের হোনেওয়ালাকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে না, পাহাড় হতে গড়িয়ে পড়তে হবে না। প্রত্যেক বের হোনেওয়ালা নিজের শরীরের ব্যবহারের তরতীব পাল্টাবে। যে দেমাগ দ্বারা সে এই চিন্তা করত যে কি ভাবে তার দুনিয়া ঠিক হয়ে যায় সেই দেমাগ দ্বারা এখন সে আল্লার বড়াই, আল্লার ওয়াদা, জান্নাতের নেয়ামত, জাহান্নামের আযাব, কিয়ামতের দিন কত আযাব হবে, কবরের সংকীর্ণতা সম্পর্কে চিন্তা করবে। যদি বের হয়ে দেমাগের ব্যবহার এই লাইনে করে তবে এর প্রভাব দিলে পড়বে। এতে দিলে আখেরাতের ফিকির পয়দা হবে । আর যদি দিলে আখেরাতের ফিকির পয়দা হয়ে যায় তাহলে আল্লাহতায়ালা দিলের মধ্যে এমন এক শক্তি রেখেছেন যে, দিল শরীরকে হুজুর (সাঃ) এর নিয়ে আসা পাকিজা তরিকার উপর চলার জন্য তৈরী করবে, খারাপ কাজ, আল্লার নাফরমানি হতে শরীরকে বাধা দিবে; এমন এক শক্তি দিলে আছে। বাহিরে বের হয়ে যত বেশি মনোযোগ সহকারে ধ্যানের সাথে নামাজ পড়ার মশক হবে, ওয়াক্তের সাথে, নিজের ব্যস্ততার কুরবানীর সাথে, তত বেশি নিজ ব্যস্ততার জিন্দেগীতে মনোযোগ সহকারে ধ্যানের সাথে নামাজ পড়া আসবে। আর নামাজের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল ইযযাত কুরআন পাকের মধ্যে এই খবর দিয়েছেন যে নামাজ ইসলামের মধ্যে এমন এক আমল যার সংশোধন হয়ে গেলে ঐ ব্যক্তির দিল হতে ফাহেশা, মুনকারাত-এর জজবা বের হয়ে যাবে এবং আল্লার এতাআতের জজবা এসে যাবে।

সকাল সন্ধ্যায় এহতেমামের সঙ্গে আল্লার নাম স্মরণ করে যেন আল্লাহপাকের নাম নেওয়ার যে তাসির তা সম্পর্কে বলেন, আল্লাহপাক তাঁর নাম নেওয়ার বরকতে আস্তে আস্তে দিল থেকে গাফলত দূর করে দেন এবং আস্তে আস্তে তাঁর দিলে আল্লাহর তায়াল্লুক পয়দা করেন, রাসিখ করেন অর্থাৎ জমাত এই ঈমানওয়ালার দিলে যদি যাররা পরিমাণ আল্লাহপাকের তায়াল্লুক পয়দা হয়ে যায় তবে তার মধ্যে এমন এক শক্তি নিহিত আছে যে, সেই তায়াল্লুক দিলকে ভিতর থেকে তাকে আল্লাহপাকের হুকুম মানার জন্য ও নাফরমানি হতে

BANGLAKITAB.com

বেঁচে থাকার জন্য তৈরী করবে।

ফাজাইলের তালিমে যেন দুই ওয়াক্ত তলবের সাথে ও এহতেমামের সাথে বসে। ফাযাইলে ইলমের মধ্যে এই তাসির আছে যে, যত বেশি ফাযাইলের ইলম দিলে বসবে, রাসিখ হবে তত বেশি ঐ আমলের সাচ্চা তলব দিলে পয়দা হবে - যে আমলের ব্যাপারে আল্লাহপাক খুশি হয়ে কবরের ঘাঁটিকে সহজ, আসান করবেন। ফাযাইলের তালিমে মুনকারাতের ওয়ীদ শুনবে। প্রথমে দিল মুনকারাতের লোকসান সম্পর্কে অবগত হবে এবং আল্লাহপাক দিলের মধ্যে ঐ ক্ষমতা এবং শক্তি রেখেছেন যে দিল পুরা শরীরকে ঐ মুনকারাত হতে ফিরিয়ে রাখবে। যদি দিলে মুনকারাতের ক্ষতি বসে যায় এবং ওয়াকিফ হয়ে যায় তবে দিল প্রত্যেক ঈমানওয়ালাকে আল্লাহর নাফরমানি হতে ফিরিয়ে রাখবে।

যেখানে আল্লাহপাক ঐ বান্দাকে পৌঁছান, সেখানে গিয়ে যেন খুসুসী মুলাকাত করে, ওখানে যাঁরা (পুরনো) কাম কারনেওয়ালা তবকা আছে, ওখানে যে খাস তরকা আছে, ওখানে যেসব আলেম আছেন যাঁদের দিলে কালাল্লাহ, কালা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আছে, তাঁদের সাথে মোলাকাত করবে। কালাল্লাহ, কালা রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইলমের বরকত নেবার জন্য হাজির হওয়া, কারগুজারীর লাইনে কিছু কথা বলা যেতে পারে। যে কোন নামাজের পূর্বে ঐ মসজীদের আশেপাশে যত ঘরবাড়ি আছে তাতে যত বালেগ ঈমানওয়ালা আছে তাদের সাথে মুলাকাত করবে এবং তাদেরকে ঘরবাড়ির পরিবেশ থেকে মসজিদের পরিবেশে আসার চেষ্টা করবে। তাদের নিয়ে মিলেমিশে ফারিজা আদায় করবে। ফারিজা আদায় করার পর তাদের একত্রে করে খুব সহজভাবে বুঝাবে যে, দ্বীনের উপর চলা প্রত্যেক ঈমানওয়ালার জন্য জরুরী। দ্বীনের উপর চলার দ্বারা আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি হাসিল হবে। মৃত্যু আসবে আর এই সুবর্ণ সুযোগ হাত হতে ছুটে যাবে, আর পাওয়া যাবে না। দ্বীনের উপর চলার যে সময় তা হল মৃত্যুর আগে, মৃত্যুর পরে নয়।

এখন দ্বীন কি? আল্লাহপাক তাঁর নবীর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা জিন ও মানুষের জন্য এক সহজ ও আসান তারিকা দিয়ে পাঠিয়েছেন। এই তরিকার পাবন্দ হয়ে, মুকাইয়েদ হয়ে জীবন অতিবাহিত করা। নিজের জিম্মাদারী বুঝে, খায়ের খাহী জজবার সঙ্গে মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে, বুঝাতে হবে। যদি কেউ তৈরী হয়ে যায়, তার তারতীব করা শেষে ঐ মসজিদে মসজিদওয়ার

জামাত বানান যাতে করে মানুষ কিছু না কিছু সময় তালিমে দেয়, ২৪ ঘন্টার মধ্যে আড়াই ঘন্টা মসজিদ আবাদীর জন্য দেয়, মাসে তিন দিন লাগায়। এইভাবে মসজিদওয়ার জামাতের কাজগুলো বুঝাতে হবে।

এই ভাবে মেহনত করলে নিজের জীবনের এই পাকিজা আমলগুলো আসবে আর মানুষের মধ্যেও এই আমলগুলো আসতে থাকবে। এটা তার জন্য আখেরাতের এক (গচ্ছিত) সম্পদ হবে। এইভাবে মেহনত করার বরকাতে অন্য বান্দাও এই মেহনতে আসবে। আল্লার বড়াই এর দাওয়াত দেওয়ার বরকতে দিলে আল্লাহর বড়াই বসবে, হুজুর (সাঃ) এর তারিকার মূল্য দিলে বসবে, রাসিখ হবে। তাহলে সব ঈমানওয়ালা - শহরের হোক, গ্রামের হোক, হাকিম হোক, মাহকুম হোক, শিক্ষিত হোক, অশিক্ষিত হোক সবাই ঠিকভাবে জীবনযাপন করতে পারবে এবং এতে আল্লাহ খুশি হয়ে তার আখেরাতের জীবন সুন্দর করবেন, সব ঘাঁটি সহজ করে দেবেন।

এইভাবে জামাতে বের হয়ে ৬ নম্বর হাসিল করার জন্য মেহনত করতে হবে। ৬ নম্বরের মধ্যে প্রথম নম্বর হল ঈমানের নম্বর। ঈমানের নম্বরের ব্যাপারে বড় হযরতজী ইলিয়াস সাহেব (নাউ অরাল্লাহু মারকাদাহু) এই কথা বলে থাকতেন যে, ঈমানওয়ালা যদি মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানী মেহনতে লেগে থাকে তবে ঈমানের শেষ সীমায় পৌঁছাতে পারবে না। ঈমানের ব্যাপারে দ্বিতীয় এই কথা বলতেন যে, ঈমানওয়ালা যদি নিজের ঈমান বাড়ানোর কাজে লেগে থাকে তবে একদিন আল্লাহপাক তার ঈমানকে এমন এক স্তরে পৌঁছে দেবেন যে এই ঈমানওয়ালার ঈমান ভিতর থেকে তাকে হুজুর (সাঃ) এর নিয়ে আসা পাকিজা তারিকার উপর চলার জন্য এবং অন্য ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য তৈরী করবে। আর যদি কেউ ঈমানের মেহনত ছেড়ে দেয় তবে তার ঈমানের মধ্যে ঘাটতি আসবেই। আর ঈমানে ঘাটতি এলে সে হুজুর (সাঃ) পাকিজা তরিকা হতে দূরে সরে যেতে থাকবে। আর যে পরিমাণ হুজুর (সাঃ) এর তরিকা তার জীবন থেকে ছুটে যাবে তত বেশি আখেরাতের ব্যাপারে ক্ষতি তার জীবনে আসতে থাকবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন।

এই জন্য সবাইকে তিন লাইনে মেহনত করতে হবে। এক হল, আল্লার বান্দার কাছে আল্লার বড়াই বয়ান করবে। প্রায় সোয়া লাখের মত যে নবী (আঃ) দেরকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন তাঁদের সবচেয়ে বড় ওযিফা

BANGLAKITAB.com

ছিল, আল্লার বান্দাদের নিকট আল্লার বড়াই বয়ান করা। এটা কত বড় কাজ। দ্বিতীয়তঃ কোন আল্লাহর বান্দা যখন আল্লাহর বড়াই বয়ান করে তখন ধ্যানের সঙ্গে তা শুনা চাই। তৃতীয়তঃ নিজের ঈমানের ব্যাপারে নিজেকে ফকির হতে ফকির মনে করে আল্লাহর কাছে দোআ করা চাই। হযরতজী ইলিয়াস (রঃ) বলতেন, যে ব্যক্তি ঈমানের এই তিন লাইনে মেহনত করবে আল্লাহ পাক একদিন তার ঈমানকে এই স্তরে পৌঁছাবেন যে, এই ঈমানওয়ালার ঈমান তাকে ভিতর থেকে হুজুর (সাঃ) এর তরিকায় চলার জন্য তৈরী করবে এবং তাঁর তরিকার খেলাফ চলতে বাধা দিবে। আর দ্বীনের ব্যাপারে বলতেন যে, আল্লাহ যা কুরআনে নাযিল করেছেন তাই দ্বীন। "আল ইয়াওমা ..... ইসলামা দ্বীনা।"

আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম, নেয়ামত পূরণ করলাম, তোমাদের জন্য ইসলামকে আমার মনোনীত দ্বীন বানালাম। বাক ও কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের সফলতার জন্য এই পরিপূর্ণ দ্বীন হুজুর (সঃ) এর মারফৎ পাঠিয়েছেন।

দ্বিতীয় নম্বর নামাজের ঃ নামাজের ব্যাপারে বলা হয় যে, পুরা দ্বীন নাযিল করার জন্য আল্লাহপাক জিবরাঈল আমীন (আঃ) কে মাধ্যম বানিয়েছেন। কিন্তু যখন নামাজ পাঠানোর ইরাদা করলেন তখন এই নিয়ম ভেঙ্গে ফেললেন। জিবরাঈল (আঃ) কে মাধ্যম বানাননি। হুজুর (সাঃ) কে মেরাজে নিজের কাছে ডেকে নিয়ে গেলেন। খাস হুজুরীতে খুবরী দিলেন যেখানে জিবরাইল (আঃ) শামিল ছিলেন না। এরপর নামাজ দিলেন। "মাকসুম সময়ে নাকমুস রূপে সমস্ত সৃষ্ট জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লার হুকুমে মাশগুল করার নাম নামাজ।।" কারবারী লোকদেরকে নামাজের জন্য কারবার ছাড়তে হয়, কৃষকদেরকে কৃষিকাজ ছাড়তে হয়। নামাজ এমন হুকুম যে, উত্তম কাজ যেমন কুরআন শেখা এবং শিখানোকেও নামাজের সময় ছাড়তে হয়। এমনকি বায়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফকারীদেরও নামাজ আদায় করার সময় তওয়াফ ছাড়তে হবে।

এই নামাজের জন্য তিন লাইনে মেহনত করতে হবে। প্রথমতঃ নিজ অবস্থানে অথবা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যদি কোন হুজুর (সাঃ) এর উম্মতকে ফারিজানা আদায় করতে দেখে তবে চোট লাগা চাই এবং বড়ই শফকত এবং মহব্বতের সাথে তাকে দাওয়াত দেওয়া চাই। তার মেহনতে এই লোক ফারিজা আদায়কারী হবে এবং দায়ীর জন্য এটা খুব বড় সম্পদ হবে এবং নিজের নামাজের

মধ্যে জান পয়দা হবে। দ্বিতীয়ত ঃ যখন আল্লাহপাক তার বান্দাকে নামাজ পড়ার তৌফিক দিবেন তবে নামাজের বাহির ও ভিতর ঠিক করা চাই। নামাজের কহির হল - কুরআন পড়া, যারা জানে তাদের পড়া চাই, যারা জানে না তাদের শেখা দরকার; রুকু, সিজদা ঠিক করা; পাক হওয়া; ওলামাদের থেকে মাসাইল জানা। অপরদিকে নামাজের ভিতর ঠিক করা। ভিতর হল, পুরা নামাজে এই ধ্যান হওয়া যে আমি আল্লাকে দেখছি অথবা আল্লাহ আমাকে দেখছেন। তৃতীয়তঃ নামাজ শেষে শুকর ও ইস্তেগফার হওয়া চাই। শুকরিয়া এই জন্য যে কত বান্দা আজ নামাজের তৌফিক পায়নি। আল্লাহপাক আমাকে এই নামাজের তৌফিক দিয়েছেন, এজন্য শুকরিয়া। শুকরিয়া করার দ্বারা নেয়ামত বাড়বে। আর সঙ্গে সঙ্গে ইস্তেগফার করা চাই কেননা আল্লাহ পাকের নামাজ যত বড় উঁচু এবং এবং গুরুত্বপূর্ণ আমি তা যথাযথ ভাবে পুরা করতে পারিনি। ঈমানওয়ালা এই তিন লাইনে এই তরতীবে যদি নামাজের উপর মেহনত করতে থাকে তবে তার নামাজ একদিন এমন এক স্তরে পৌঁছাবে যে নামাজ তাকে ফাহেশা ও মুনকারাত হতে ফিরিয়ে রাখবে, আল্লাহর হুকুম আদায় করাবে। তৃতীয় নম্বর হল ইলম ও যিকির। আজ প্রত্যেক উম্মত এবং উম্মতের দিল হতে এমন এক ইলম বের হয়ে গেছে যে ইলম দিলে রাসিখ হয়ে তাকে কামেল দ্বীনের উপর চলার জন্য ভিতর হতে তৈরী করত। এটাই ফাজাইলে ইলম। হযরতজী ইলিয়াস (রঃ) অথবা হযরতজী ইউসুফ (রঃ) এটা বলতেন যে, দ্বীনের উপর চলা অথবা নামাজ পড়ার জন্য মাসাইলে ইলম তো লাগবে কিন্তু মাসাইলে ইলম শিখতে যে জিনিস উদ্বুদ্ধ করত তা হল ফাযাইলে ইলম। ফাযাইলে ইলম মাসাইলে ইলমের চাইতে মোকাদ্দাম। যত বেশি ফাযাইলে ইলম দিলে রাসিখ হবে ততবেশী হুজুর (সঃ) এর তরিকার শওক ও তলব দিলে পয়দা হবে। এভাবে প্রত্যেক মুসলমান হুজুর (সঃ) এর পাকিজা তরিকার উপর চলনেওয়ালা হয়ে যাবে।

এজন্য উম্মতকে এই ফাযাইলে ইলমের দাওআত দিতে হবে। আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে ফাযাইলে তালিমের হালকায় বসতে হবে। নিজ অবস্থানে নিজের মাশাগিলের সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে তালিমে বসতে হবে এবং ঘরের মধ্যে ফাযাইলে তালিমের হালকা কায়েম করতে হবে এবং আল্লাহর নিকট দোআ করতে হবে। যে ঈমানওয়ালা এই তিন লাইনে ফাযাইলে ইলম হাসিল করবে বা করার মেহনতে লেগে যাবে একদিন আল্লাহপাক তার দিলে ফাযাইলে ইলম বসাবেন, রাসিখ

BANGLAKITAB.com

করবেন। এর ফলে যে কোন যোগ্যতার লোক হোক না কেন, চাই শহরের বা গ্রামের, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত তার দিল ভিতর হতে তাকে দ্বীনের উপর চলার জন্য তাকে তৈরী করবে এবং নাফরমানি হতে বাঁচাবে। ফাযাইলে ইলমের ব্যাপারে বলতেন যে, মক্কার জিন্দেগীতে কুরআন নাযিলের ক্ষেত্রে ফাযাইলের লাইনে নাযিল করেছেন আর হুকুমের লাইনে কুরআন মাদিনায় নাযিল করেছেন। বাস, হুকুমের লাইনে শুধু নামাজই মক্কায় নাযিল হয়। বাকী যে দ্বীন আমাদের নিকট আছে তা পুরা মদিনায় নাযিল করেছেন। সাহাবা (রাঃ) দের মধ্যে এমন এক শওক সৃষ্টি হয়েছিল যে মদিনায় আল্লাহর কোন হুকুমকে বুঝানোর প্রয়োজন পড়ে নি। শুধু এতটা বলাই যথেষ্ট ছিল যে এটা আল্লার হুকুম। যখন মদ হারাম হওয়ার হুকুম এসেছিল তখন এই হুকুম জানানোর জন্য মসজিদে সাহাবাদের একত্র করার প্রয়োজন হয় নি; বরং একটা ঘোষণাই যথেষ্ট ছিল। ঘোষণা শেষ হওয়ার সাথে সাথে মদিনায় মদের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। দিলের মধ্যে ফাযাইলে ইলম এমন ভাবে রাসিখ হয়েছিল যে, দিল ভিতর থেকে তাঁদের মদ ছাড়ার জন্য তৈরী করেছিল।

এর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর স্মরণ হওয়া চাই। তাই সকাল সন্ধ্যা যিকির করা চাই। এই যিকিরের দাওয়াত দেওয়া ও দোআ করা চাই। যিকিরের দ্বারা এই ফল হয় যে আল্লাহপাকের নামের স্মরণ করার বরকাত ধীরে ধীরে দিল হতে গাফলত দূর হয়ে যায়। আল্লাহর সম্পর্ক ও ধ্যান সৃষ্টি হতে থাকে। এক যাররা আল্লাহর সম্পর্ক যদি কোন ঈমানওয়ালার দিলে সৃষ্টি হয়ে যায় তবে এর মধ্যে এমন এক শান্তি আছে যে এটা ভিতর থেকে তাকে হুজুর (সাঃ) এর নিয়ে আসা পাকিজা তারিকার উপর চলার জন্য তৈরী করবে এবং এই তারিকার খেলাফ চলা হতে তাকে বাধা দিবে। এর জন্য যিকিরের দাওয়াত দেওয়া, নিজে এর এহতেমাম করা ও দোওয়া করা চাই।

চতুর্থ নম্বর ইকরামুল মুসলিমিন ঃ এর বুনিয়াদ অনেক বড়। একজন নিকৃষ্টতম ঈমানওয়ালার ঈমানের জন্য আল্লাহপাক তাকে এই দুনিয়ার চেয়ে দশগুণ বড় জান্নাত দিবেন। ঈমানের মূল্য এত বেশি। আর সবাইকে ইকরামুল মুসলিমিনের জন্য মেহনত করা প্রয়োজন। ঈমানের লাইনে কোন শাখা দুর্বল থাকলে তা দূর করার জন্য মেহনত করা। কিন্তু ঈমানের জন্য এক জন ঈমানওয়ালার যে দাম এটা বুঝার জন্য সবাইকে মেহনত করতে হবে। যতবেশি

দিলে ইকরামে মুসলিমিন জিন্দা হবে তত এই উম্মতের মধ্যে বিভেদ দূর হবে, একতা আসবে এবং অমুসলমানদের ইসলামের উপর আসার রাস্তা খুলে যাবে। অমুসলমান ইসলামের দিকে নামাজ, লেবাস দেখে আসবে না; বরং অমুসলমানকে ইসলামের দিকে মুতাআস্মির করার জিনিস হল মুসলমানদের আখলাক। যে দিন উম্মতের মধ্যে আখলাক আসবে সে দিন অমুসলমান দৌড়ে দৌড়ে ইসলামের দিকে আসবে। এর জন্য কিছু মেহনত করা প্রয়োজন।

পঞ্চম নম্বর ইখলাস ঃ ইখলাসের ব্যাপারে এই বলেছেন যে, কোন কাজ করার পূর্বে দিলের ইরাদা দেখা প্রয়োজন যে এটা আল্লার জন্য কি না। যদি আল্লাহপাকের জন্য হয় তবে মুখলিসিন বলে সাব্যস্ত করা হবে। আর যদি দিলের ইরাদা দ্বীন না হয়, চাই দ্বীনের যতবড় হুকুম হোক না কেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে মুখলিসিন বলে সাব্যস্ত হবে না। যদি আল্লাহর নিকট কেউ মুখলিস বলে সাব্যস্ত হয় তবে তার জন্য বড় উপকারী হবে নতুবা হবে অনেক বড় ক্ষতি। এজন্য অন্যকে দাওয়াত দেওয়া, নিজের আমলগুলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা এবং আল্লার নিকট তৌফিক চাওয়া চাই। এই তিন লাইনে মেহনতের দ্বারা আল্লাহপাক তাকে মুখলিসিনদের মধ্যে শামিল করবেন এবং তার বেড়া পার হয়ে যাবে।

ষষ্ঠ নম্বর হল তাবলীগ। আল্লার রাস্তায় বের হওয়া। আজ ঈমানওয়ালারা জানমালের ব্যবহার কুরআনের খিলাফ ভাবে করছে। সে জানমালকে নিজের মনে করে। আর আল্লাহতায়ালা বলছেন, "আল্লাহ মুমিনের জানমালকে জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন।" এজন্য কোন ঈমানওয়ালা না তার জানের মালিক, না তার মালের মালিক। এই জানমালের ব্যবহার আল্লাহপাক নির্দিষ্ট করেছেন। এজন্য সবাইকে এ কথার দিকে রুজু করা দরকার।

একজন ঈমানওয়ালার জানমাল খরচের সবচেয়ে মুকাদ্দাম জায়গা হল আল্লাহর কালিমা বুলন্দ করার জন্য বাবহার করা। যখন কালিমা বুলন্দ করার তাকাযা আসে তখন সব কিছু ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হবে। কারবারী কারবারকে (ছাড়তে হবে), এমনকি এই তাকাযা পুরা করার জন্য ক্ষুধার্তদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হতে হবে। এরপর উম্মতের মধ্যে গরীব, বিধবা, এতিম এসবের জন্য জানমাল খরচ হবে। মসজিদের জন্য খবর নেওয়া, এই দুই তাকাযা পুরা হওয়ার পর দ্বিতীয় তাকাযা আসার আগে আগে হালাল উপায়ে রুটি উপার্জনে লাগা যাবে। যতক্ষণ উম্মত এই অবস্থায় ছিল ততক্ষণ আল্লাহর সাহায্য আসতেছিল;

BANGLAKITAB.com

তাঁরা নিজেরা ফুলতেছিলেন; অমুসলমান ছুটে ছুটে ইসলামের দিকে আসতেছিল। আর যখন উম্মত নিজের জীবনের উদ্দেশ্য কামাই বানিয়েছে তখন তাদের ইয্যত নষ্ট হয়েছে। সবাই তাদের হেয় করছে। অবস্থা এত খারাপ হয়েছে। এখন উম্মত তো আল্লাহর হুকুম নষ্ট করছে। এটা দেখার পরও আমাদের অন্তরে কোন ব্যথা নেই। এটা বড় দুঃখের কথা। এই জন্য আমরা ৪ মাসের জন্য (এই মেহনতের জন্য) বের হই। তা হলে আল্লাহপাক আমাদের অন্তরে এই মেহনত খুলে দিবেন এবং এই মেহনতকে মাকসাদ বানানোর তওফিক দিবেন।

BANGLAKITAB.com

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

মাশওয়ার গুরুত্ব ও আদবের বায়ান

দাওয়াতে তবলীগের মধ্যে মাশওয়ারার গুরুত্ব অনেক বেশি। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে কুরআন শরীকে বর্ণনা করেছেন, মাশওয়ারা করে চলনে ওয়ালারা আল্লাহপাকের সবচেয়ে বেশি নৈকট্য হাসিল করে। আর যারা মাশওয়ারার মত চলে না তারা শয়তানের জালে পড়ে যায়।

মাশওয়ারার আদব বড় সূক্ষ্ম। এ জন্য তারাই ঐসব আদব সমূহ পূরা করতে সক্ষম হবে যাদের মধ্যে দাওআতের শিফাত পয়দা হয়েছে।

শিফাত্ নিম্নরূপ ঃ

১) মাশওয়ারা করনেওয়ালা আল্লাহপাকের দিকে মুতাওয়াজজা হয়ে বসবেন যেন আল্লাহ পাক যেন আমাদের মাশওয়ারাকে শুনছেন যদি আমরা দুজনে মিলে মাশওয়ারা করি তাহলে বুঝতে হবে তৃতীয় হলেন, আল্লাহতায়ালা। যদি আমরা তিনজন হই তবে, চতুর্থ জন হলেন আল্লাহতায়লা। ইহাই আল্লাহতায়ালা কুরআন শরীকে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আপনি কি ভেবে দেখেন নি যে, নভমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে আল্লোহতায়লা তা জানেন। তিন ব্যক্তির এমন কোন মাশওয়ারা হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন। এবং পাঁচজনের ও এমন কোন মাশওয়ারা হয় না, যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন । এত দপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, তিনি কেয়ামতের দিন তাদেরকে তা জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।”

২। আমাদের মাশওয়ারা করনেওয়ালাদের দিলে আপোষে মহব্বত হতে হবে, যেহেতু হদিসে কুদসীতে আছে, “আপোষ মহব্বতকারীদের জন্য আমার মহব্বত ওয়াজিব করে দিলাম।”

৩। আপোষে এমন মন কষা কষি না হয় যে, উভয়ের দিলের মধ্যে এখতেলাফ হয়ে যায় এবং দিলের দিক দিয়ে একে অপরকে ঘৃণা করে।

৪। কেউ কাহারও প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হবে না। নতুবা আল্লাহতায়ালার রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং ঈমান দুর্বল হয়ে পড়বে। হহরত মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) বলতেন ঃ “কামকারনে ওয়ালাদের উপর আমার দুটো ভয়, প্রথমত

নিজের মধ্যে ছয় নম্বরের গুনকে পয়দা না করা এবং শুধুমাত্র জামাত বের করতে থাকা, ফলে নিজেও দুর্বল হতে থাকবে। নিজের মধ্যে ছয় নম্বরের হকীকত পয়দা করা জরুরী। অর্থাৎ যাতে কলেমায়ে তৌহিদের মেহনতের দ্বারা নিজের ঈমান বাড়তে থাকে। নিজের নামাজের মধ্যে খুশু ও খুজু পয়দা হতে থাকে । নিজের মধ্যে বর্তমানে আল্লাহ হুকুম কি উহা পুরা করবার জজবা পয়দা হতে থাকে, এবং যিকিরের দ্বারা আল্লাহপাকে নৈকট্য হাসিল হতে থাকে। একে অপরের প্রতি ইকরাম ও হক আদায় করবার ফিকির বাড়তে থাকে এবং বেএকরামী থেকে নিজেকে বাঁচার চেষ্টা করতে থাকে। নিজের কারনে অন্যের দিলে কষ্ট না হয়। দ্বিতীয়ত আমাদের মাশওয়ারা আল্লার দরবারে কবুল হচ্ছে কি না এ সম্পর্কে ভীত থাকা।

মাশওয়ারার তরীকা (করার নিয়ম)ঃ

১) কেহ যেন নিজের রায়কে এক্কীনের সাথে সহীহ না ভাবে নতুবা এটাই প্রমানিত হবে যে, আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে সহীহ রায়ের ফয়জান হচ্ছে। কেন না এ মাকাম সবার জন্য নয়।

২) কেহ নিজের রায়ের উপর এসরার করবেন না। এটা দ্বারা অহঙ্কার প্রকাশ পাবে এবং নফস জয়ী হবে। শয়তান তখন মাশওয়ারাওয়ালাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবে ও আপোষে শত্রুতা সৃষ্টি করবে।

৩) কোন রায় দেনেওয়ালা অন্যের রায়কে প্রত্যাখ্যান করবে না। এতে ঐ ব্যক্তি অপমানিত হয়। বরং অন্যের রায়কে এই মনে করবে যে হতে পারে এর মধ্যে খায়ের আছে। প্রত্যেকের একরাম বজায় রেখে নিজের রায়কে পেশ করবে। এটাই হল আল্লাহপাককে রাজী করার উপায়।

৪) মুখকে মিষ্টি করে ও দিলকে নরম রাখবে। আল্লাহতায়লো হুজুর(মাঃ) এর শিফাত বয়ান করেছেন এবং একটি জিনিসের প্রতি সতর্ক করেছেন যা আমাদের জন্য বড় শিক্ষামূলক। আল্লাহতায়ালা হুজুর (সার) কে নরম বানিয়েছেন যদি তিনি কটুকথা ও শক্ত দিলওয়ালা হতেন তবে তিনি নবী হওয়া সত্ত্বেও এবং সমস্ত শিফাতের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কেহই হুজুর (সাঃ) এর সাথে জুড়ত না বরং আলাদা জয়ে যেত। এটা আখলাকের উচ্চ দরজার শিফাত। যার মধ্যে উক্ত শিফাত এসে যাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার প্রিয়বান্দা হয়ে যাবে। উম্মত তার সাথে জুড়তে থাকবে এবং তার মধ্যে খিলাফতের শিফাত হাসিল হবে। অর্থাৎ মানুষের দিলের মধ্যে তার খিলাফত হাসিল হবে। সুতারং মাশওয়ারা বড় সূক্ষ্ম আমল।

এর দ্বারাই দুনিয়াতে দাওয়াত ছড়াবে এবং দায়ীর দরজা (মর্তবা) কায়েম হবে। দুনিয়াতে দাওয়াত ? উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন দল ও ইনসাফকে শেষ করে দিয়েছে। বাতেল জয়ী হয়ে গেছে। হকওয়ালাদের বাতেলের অনুগত করে দিয়েছে। এ জন্য দাওয়াতকে সর্বপ্রথম জিন্দা করতে হবে এবং প্রত্যেক মুসলমানকে তার জীবনের উদ্দেশ্য অর্থাৎ দাওয়াতের উপর আনতে হবে। এবং প্রত্যেকে দায়ী বানাতে হবে যেন তার গোটা জীবন কুরআন ও হাদীসের বাতান তরীকার উপর এসে যায়। তবেই আল্লাহওয়ালার তরফ থেকে রহমত, বরকত দিলের শান্তি এবং আল্লার মদদ ও সাহায্যের দরজা সমূহখুলে যাবে। এবং আল্লাহওয়ালার গায়েবী নিজাম পক্ষে হয়ে যাবে। তখন ঐ ব্যক্তি উভয় জাহানেই কমিয়ার হবে। আল্লাহতায়ালা স্বীয় নবী (সাঃ) এর শানে একটি আয়াত নায়িল করেছেন যার অর্থঃ আপনি সাহাবায়ে কেরামদের সাথে পরামর্শ করুন।

পরে অন্য আয়াত নাযেল করেন যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে এবং নামাজ কায়েম করে, একে অপরের সঙ্গে পরামর্শ করে এবং তাদের কে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে"।

কিয়ামাত পর্যন্ত আনেওয়ালা উম্মত মাসওয়ারার সাথে চলবে তবে সঠিক পথে থাকবে। এই জন্য বদরে যাব্বারবিন মুনজার (রাঃ) এর রায়কে জিব্রাইল (আঃ) এর দ্বারা সহীহ প্রমান করেছেন। বদবের কয়েদীদের ব্যাপারে হজরত উমার (রাঃ) এর রায় মোতাবিক আয়াত নাযিল করেছেন এবং হুজুর (সাঃ) ও হুদের যুদ্ধে নওজোয়ানেদের রায়কে কবুল করে নিয়েছেনে এবং আল্লাহ তয়োলা উহাকে ভুল বলেন নাই। এটা আমাদের জন্য ওসূল কায়েম করেছেন। যখনই এই ওসূল আমাদের মধ্যে জিন্দা হয়ে যাবে, তখন উম্মতে মুসলেমার মধ্যে ইমান ও ইসলামের জজবা পুরাপুরি এসে যাবে এবং তারা বাতিলদের উপরে জয়ী হবে।

হজরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব (রঃ) ফরমাইয়েছেন আল্লাহ চাইলে বাতিলকে হকের দিকে ফেরাবেন এবং যারা হকের দিকে ফিরবে না, তাদেরকে চকরাও পয়দা করে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবেন। অথবা আপোসের মধ্যে লড়াই, লাগিয়ে দেবেন। সম্ভবতঃ নিম্নের এই আয়াতের অর্থের ইঙ্গিত এই দিকেই - "এবং আমি সত্যকে মিথ্যার উপরে নিক্ষেপ করি; অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তককে চূর্নবিচূর্ণ করে দেয়; অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তোমরা যা বলছ তোমাদের জন্য তা দুর্ভেদ্য।"

প্রথম দাওআত অলার মুজাহাদার মধ্যে চলবে এবং আল্লাহতায়ালা পরীক্ষা

নেবেন যা এই আয়াতে ফরমান। "এবং অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব। কিছুটা ভয় দেখিয়ে ও ক্ষুধা দিয়ে, মালওজানের ক্ষতি, ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের।" এবং সর্বশেষ ফরমানঃ "তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়েরে পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। এরূপ লোকেদের মর্যদা বড় তাদের অপেক্ষা যারা পরে ব্যয় করেছেও, জেহাদ করেছে, তবে আল্লাহ উভয়কেই কল্যানের ওয়াদা দিয়েছেন।"

মুজাহাদার পর খোশখবরীর ওয়াদা যে যত জানও মলের এবং নিজের দুনিয়াবী তাকাচ্যাকে তাকাযকে কুরবানী এমন ভাবে দিতে থাকবে যে, নিজের জান ও মাল আল্লাহতায়ালার রাস্তার বেশি বেশি লাগে এবং নিজের দুনিয়ারী তাকাযার কুরবানী এমন ভাবে দিতে থাকবে যে, নিজের জান ও মাল আল্লাহতায়ালার রাস্তার বেশি বেশি লাগে এবং নিজের দুনিয়াবী তাক্য ? ভঙ্গ হয় এবং দিল ও দেমাক আল্লাহতায়ালার দ্বিনের মধ্যে লাগে তবে সে সাবেকনদের মধ্যে হবে। এবং তাদের সাথে চলনেওয়ালারা আসহাবুল ইয়ামিনদের মধ্যে হবে। আর এরা উভয়েই হবে কামিয়াব। তারপর আল্লাহতায়ালা একটি আয়াতে মুজাহিদিনদের দুটো দরজা কায়েম করেছেন। কখনই মক্কাবিজয়ের পরে ঈমানওয়ালাদের মর্তবা আগের ঈমানওয়ালাদের বরাবর হতে পারবে না। কারন মক্কাবিজয়ের পর গনীমতের মাল ব্যাপক আসা শুরু হল এবং জয়ের আশা কায়েম হয়ে গেল।

(হযরত মাও লানা সাইয়েদ, ঘান সাহেব ১৯৯৯ সালে হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেবের আখেরী হজ্বের সরকারী উপরোক্ত এরশাদাও মদীনা মানওয়ারায় হজরতজী (রহঃ) এর কাছে লেখেন। হজরতজী (রহ) পড়ার পর তাঁহার সাবের সঙ্গীসাথীদের মধ্যে পড়ে শোনান হয়।)

মাশওয়ারা সম্পর্কে

হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব (রহঃ) - এর কথা ঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ইস্তেখারা করে সে ব্যক্তি কখনো আফশোস ওঠাবেনা এবং যে মাশওয়ারা করে সে কখনো না - কামিয়াব, হবে না। এজন্য মাশওয়ারা বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। সবাইকে জুড়ে মিলে বসতে হবে। প্রত্যেকেই বসে চিন্তা করবে, রায় বের করবে, তখন আল্লাহজাল্লা শানুহু সরল পথ দেখিয়ে দেবেন। এর মধ্যে খুব ফিকির করতে এবং গুরুত্ব দিতে হবে যেন কারোর রায় কাটা না হয়, কাউকে যেন তিরস্কার করা না হয়, কাউকে ছোট মনে করা না হয় এবং কারোর রায়ের উপরে হাঁসা না হয়। নিজের যে রায়টা মনে আসবে সেটা বলে দেবে। অন্যের রায়কে গুরুত্ব সহকারে শুনবে। মাশওয়ারার পর যা ফয়সালা হয় তার মধ্যে আল্লাহতায়ালা খাইর দেবেন, আল্লাহতায়ালা আমাদের মাশওয়ারা করার এবং তার আদব রক্ষা করার তৌফিক দান করুন। নিজের রায়ের উপরে জমে থাকা ও হঠকারিতা করা, এবং জিদ করা থেকে আল্লাহ হেফাজত করুন। রায় দেওয়া সকলের জিম্মায় আছে, কিন্তু নিজের রায়ের উপরে হঠকারিতা ও জেদ করা উচিত নয়। মাশওয়ারার মধ্যে যা ফয়সালা হবে উহাতে খাইর হবে। খাইর ত আল্লার পক্ষ থেকেই আসে। এজন্য মেরে আজীজো, বুজুর্গ, ভাইয়ো এহতেমামের সাথে মাশওয়ারা কর, মাশওয়ারার আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখো, এর মধ্যে যেন হাসাহাঁসি না হয়, এখলাসের সহিত নিজের রায় বায়ান করে দাও, তারপর যে রায়ের উপর ফয়সালা হয় তা দিল থেকে মেনে নাও। এরকম বলবে না যে আমার রায় ত মানা হল না, আমি ত পূর্বেই বলেছিলাম। মাশওয়ারা মাধ্যমে যে ফয়সালা হবে আল্লাহজাল্লা শানুহু তার মধ্যে খাইর দিয়ে দেবেন।

হুযুব (সাঃ) হজরত আবু বকর (রাঃ), হয়রত উমর (রাঃ) কে সম্বন্ধ করে বলেছেন - "যদি তোমরা দুজন কোন রায়ের উপর একমত হয়ে যাও তবে আমি তা খেলাফ করব না।" রায় দিতে, রায় নিতে এবং রায় বের করতে চেষ্টা করবে। রায়ের উপরে জেদ ও হঠকারিতা করা ঠিক নয়, ভাল ত আল্লাহই জানেন। এজন্য নিজের রায়ের দোষ তালাশ করবে না। নিজের রায়ের উপর হঠকারিতা করবে

না। যাতে যেন অন্যের রায়ের উপরে টককর লেগে না যায় যার এবং তার রায়কে যেন পেছনে নিক্ষেপ না করা হয়। অন্যের রায়ের সম্মান রক্ষা করে এখলাসের সঙ্গে নিজের রায় দেবে, ওর উপর শুকর আদায় করবে। আর যদি কবুল না হয় তাহলেও শুকর আদায় করবে। যেমন হতে পারে আমার রায়ের কোন গোপন দোষ আছে যা আমার জানা নেই, আল্লাহওয়ালা হেফাজত করেছেন - এজন্যই শুকর আদায় করবে। এভাবেই মাশওয়ারা করবে। তাহলে আল্লাহতায়ারা সহীহ রায়ের দিকে রাহবারী করবেন। আল্লাহয়ালা আমাদেরকে সমস্তওসুল অনুযায়ী চলার ও কাজ করার তৌফিক দান করুন। এবং শরীরতিরওয়ালা মধ্যে ইহাও একটি যে খাইরিয়াত আল্লাহর তরফ থেকেই আসে। নিজেদের কে শরীয়তের ওসুল অনুযায়ী বানানো এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা এবং এই ফিকিরের চেষ্টাই লেগে থাকা বড় জরুরী। আমাদের জিম্মাদারী হল, এই চেষ্টা করা যাতে আমাদের সব কাজ শরীয়ত অনুযায়ী হয়। কোন স্বার্থের জন্য না হয়। আল্লার দ্বীনকে সামনে রেখে, লক্ষ্য রেখে নিজের রায় পেশ করবে। তারপর যা ফয়সালা হবে তার উপর রাজী থাকবো। আল্লাজাল্লা শানুহু ভালাই দান করুন এবং এই আদব অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। খোদাপাক আমাদের কে শয়তানের আসর থেকে রক্ষা করুন। শয়তান প্রত্যেকের শত্রু। প্রত্যেক জিনিসে শয়তান নিজের শক্তি ব্যয় করার চেষ্টা করে। মাশওয়ারার মধ্যে ও রায় দেনেওয়ালাদের মধ্যে জিদ চেষ্টা করে। এতে বরকত নষ্ট হয়ে যায়। অতএব জিদ করবে না। হঠকারিতা করবে না। এবং মনে করবে না যে আমার রায়ই ঠিক। বরং নিজের রায় এখলাসের সঙ্গে দিয়ে দেবে। যাহা নিজের মত অনুযায়ী ঠিক বুঝবে তাই রায় দিবে। যা ফরসালা হয়ে যাবে তাতে রাজী থাকবে। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে সর্ব্বোত্তম পথে চলার তৌফিক দান করুন এবং আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে সহীহ রাস্তায় চলনে ওয়ালা বানিয়ে দেন আমীন।

''দাওয়াৎ ও তবলীগের মোবারক মেহনত সম্পর্কে বিভিন্ন মুরুব্বিদের ৪০টি মজমুন''

(ইউসুফ ভাই ট্যাক্সিওয়ালার ডায়েরী হতে)

১। দাওআতের উদাহরণ জমিনের মত। আমলের উদাহরণ গাছের মতো। এখলাসের উদাহরণ ফলের মতো। জমিনকে যত বেশী মেহনত করে চাষ দেওয়া হবে, গাছ ও ঐরূপ মোটা এবং বড় হবে। গাছ যত মোটা হবে সেইরূপ ফল সবচেয়ে ভাল হবে। মাওলানা ইলিয়াশ (রঃ) এর মাল ফুজ "সাধারণ মানুষের উদাহরণ জমিনের মতো, খাস লোকেদেরে উদাহরণ গাছের ফুল ও ফলের মতো।" সাধারণ মানুষের উদাহরণ।

ঃ মাওলানা সয়ীদ আহমাদ খাঁন সাহেবের পুরাতন কর্মীদের জন্য নসীহত যাহা তিনি খাওলানা আসাদ হুসাইন (দঃ রাঃ) কে লিখে পাঠিয়ে ছিলেন যখন মাওলানা আসাদ হুসাইন জামাত নিয়ে আসামে সফররত ছিলেন ঃ

দাওয়াতের এই মোবারক মেহনত প্রথম জামানার হীরা। যে যতটা ইহার কদর করতে পারবে সে ততটা ইহা হাসিল করতে পারবে। আর দাওআতের এই মোবারক মেহনতে ঐ ব্যক্তি চলতে থাকবে যাহার মধ্যে নিম্নের চারটি গুন থাকবে

১। কোন প্রশংসাকারী যদি আমার প্রশংসা করে তখন এটা আমি বুঝব যে সে আমার প্রশংসা করে নি, বরং ঐ ব্যক্তির দাওয়াতের কাজের প্রশংসা করছেন।

২। বাহ্যিক নেসবতের (সম্বন্ধের) ধোঁকায় না পড়ে। বাহ্যিক নেসবত যেমন হাজী সাহেব, ক্বারী সাহেব, মৌলবী সাহেব, মুবাল্লিগ সাহেব। বরং অন্তরের নেসবতকে অর্থাৎ আল্লাহর সহিত আমার তায়াল্লুককে সহীহও মজবুত করব। এই ফিকির যেন সদা বর্সদা আমার মধ্যে থাকে।

৩। আসাবিয়াত থেকে (অর্থাৎ নিজেদের কোল টানা) নিজের দিল ও দেনাককে পাক করে চলতে হবে। অর্থাৎ আমার খানদান, আমার এলাকা, আমার প্রদেশ এই সব ভেদাভেদ যেন আমার মধ্যে না থাকে।

৪। দিলজুয়ী (অর্থাৎ খাতর মাদারাত) থেকে নিজের দিলও দেমাগকে পাক করে

অর্থাৎ নিজেকে নিজে আল্লাহর রাস্তায় বার করে চালাতে হবে। যেমন কেউ আমার ইস্তেকবাল করবে, কেউ আমার দিলজুয়ী করবে - এ সমস্ত খেয়াল ভুলে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে চলতে হবে।

ঃ শেষ পর্যন্ত কাহারা এই রাস্তায় চলিতে পারিবে ঃ

এক তো খোদায়ে পাক যাকে কবুল করবেন এবং যার সাথে আল্লাহর ফজল থাকবে সেই ব্যক্তিই এই রাস্তায় চলতে পারবে। কিন্তু রাব্বুল আলামীন প্রত্যেকটা জিনিসকে হাসিল করার জন্য আসবাব বানিয়েছেন। তা নিচে বলা হল ঃ-

১। একমাত্র দাওআতেরই মোবারক মেহনত দ্বারা সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত সমস্ত সমস্যার সমাধা হওয়া যাহার নজরে অর্থাৎ দিলের মধ্যে একীন বসে যাবে।

২। পরিপূর্ণ দ্বীনকে আল্লাহ তাবারাকতঅয়ালা এই দাওয়াতেই মেহনতকে সহীহ তরীকার সঙ্গে চালিয়ে নিজের কুদরতে জিন্দা করবেন। এর বিশ্বাস যার দিলের মধ্যে দিনের পর দিন বাড়তে থাকবে সেই এই রাস্তায় টিকে যাবে। যদি মেহনতকারীর মধ্যে এই এক্বীন পয়দা না হয় তবেই সমস্যার সমাধান হওয়া যেখানে তার নজরে আসবে সেইদিকে পাল্টা খেয়ে যাবার ভয় আছে। আর এই মোবারক কাজকে ছেড়ে দিবে।

৩। দাওয়াতের মোবারক মেহনতকে দুনিয়ার গরজ ছেড়ে দিয়ে করতে হবে। এবং উহা থেকে ছেড়ে দিয়ে করতে হবে। এবং উহা থেকে নিজেকে বাঁচিয়েও রাখতে হবে।

৪। নিজের বড়দের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে ও নিজের আমীরের ফরমাবারদারীর সঙ্গে এই রাস্তায় চলতে হবে। নচেৎ নিজের মতে ও নিজের কিয়াশের উপরে চলার কারনে মানুষ কখনও না কখনও মাঞ্জিলে পৌঁছিয়ে গিয়ে ঠোকর খেয়ে যাবে। নফসও শয়তান তাকে রাব্বুল আলামিনের দরবার থেকে বঞ্চিত করে ছেড়ে দেবে।

৫। দাওআতের মোবারক রাস্তার মধ্যে চলনে ওয়ালাদিগকে একদিকে খোদার সঙ্গে সঠিক ও মজবুত তায়াল্লুক পয়দা করা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এই জন্য যে, অবস্থা খারাপি হলে ঘাবড়ে না যায় এবং অবস্থা ভাল হয়ে গেল যেন তার মধ্যে অহঙ্কার না পয়দা হয়। আর অন্যদিকে আল্লাহর বান্দাদের সহিত নিজেকে

ছোট মন করে ও ভালো আখলাকের সঙ্গে চলতে হবে। মানুষের সহিত নিজের মোয়ামলাতকে অর্থাৎ লেনদেনকে দুরস্ত করে চলতে হবে। যদি মোয়ামেলাকে পরিস্কার করার ফিকির না করে তা মানুষের তরফ থেকে লান, তান ভৎসনা ও গালমন্দ আসবে তখন সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে এই মোবারক কাজকে ছেড়ে দেবে।

৬। দাওয়াতের মোবরক মেহনতের উপরে চলনেওয়ালাদেরকে সাহাবাদের পবিত্র জীবনকে বুঝে তার আলোতে চলতে হবে অপরকে দেখে দেখে চলনেওয়ালারা শেষ পর্যন্ত টিকতে পারবে না। (অর্থাৎ প্রতিটি কর্মীকে হায়াতুস্ সাহাবা কিতাব পড়তে হবে)।

৭। দাওআতের মোবারক মেহনতে নিজের জানমালের সঙ্গে চলনেওয়ালা হতে হবে। অপরের ভরসাতে এই রাস্তায় চলনেওয়ালাদের কোন গ্যারান্টি নেই।

-ঃ সাঈদ আহমাদ খাঁন সাহেবের নসীহত ঃ-

১। এই তবলীগের কাজ খুব সূক্ষ্ম অসুলের উপরে কায়েম করা হয়েছে। কিন্তু এই বড় সহজ ঐ লোকেদের জন্য যে ব্যক্তি এই কাজের মধ্যে নিজের সংশোধন চায়।

২। কখনও কোন মুরুব্বীদের উপরে রাগ করা উচিত নয়। চাই তবীয়তের খেলাফে আমার জন্য যে কোন মাশওয়ারা হোক, এবং যেখানেই আমার যাবার ফয়সালা আমার আমীর করে দিক আমি তাহা অমান্য করবো না। কিন্তু নিজের অবস্থা আমীরও মাশওয়ারাওয়ালাদের সামনে পেশ করেদেবে।

৩। বিবির উপরে কখনও রাগ করবে না। না মা-বাপের উপরে, না ভাইদের উপরে। বরং ধৈর্য ধরে বরদাস্তের সঙ্গে তাদের দ্বারা কাজ নেবে।

৪। নিজের মেহনত ও চেষ্টাকে সবসময় খুবই কম বুঝবে। কখনোই বেশি বুঝবে না। আর না নিজেদের মধ্যে এই খেয়াল আসতে দেব যে আমিও এ পথে কিছু জানমাল পিটিয়েছি।

৫। এলেমওয়ালা ও জিকরকরনেওয়ালাদের সহিত মহব্বত রাখব। চাই উনারা তবলীগে লাগুন আর না লাগুন। চাই তারা আমার সপক্ষে হোক আর বিপক্ষে হোক। আর উনাদের সামনে নিজেকে সবসময় ছোট বানিয়ে রাখব এবং উনাদের খিদমতে দোআর জন্য মাঝে মাঝে হাজির হতে থাকব।

৬। কখনো তবলীগকে এলেমের মুকাবিলায় জিকিরের মুকাবিলায় আনব না বরং তিনটাকেই জরুরী বুঝব। কিন্তু ইহাও জানব যে, এলেমও জিকিরকে পুরো উম্মতের মধ্যে ছড়াতে চাইলে দাওয়াত ও তাবলটার আমল ছাড়া অন্য কোন আমল নেই। এই জন্য আল্লাহতায়ালা আম্বীয়া (আঃ) দেরকে দ্বিনের দায়ী বানিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন।

৭। আহলে ইলমওয়ালাদের ও আহলে জিকিরওয়ালা হজরতদেরকে হাদিয়া দিতে থাকব। চাই তা অলনই হোক।

৮। আহও জারীর সঙ্গে আল্লার দরবারে সবসময় দুআ ও ইস্তেগফার করে যাব।

৯। কাহাকেও ছোট মনে করো না। চাইসে যতই মূর্খ হোক ও নিরক্ষর হোক ও ফকির হোক। বড়লোকেদের কখনোই গরিবের উপরে অগ্রাধিকার দেবে না। বরং গরীবদের সঙ্গে বেশি হাসি খুশির সহিত মিলতে থাকবো।

১০। মুসলমানদের কোন তবকা ও কোন তরীকার লোকেদেরকে এবং কোন একজন ব্যক্তিকেও দাওয়াত দিতে ছাড়বে না। আর ইহাও যেন না বুঝি যে যদি একটা মানুষ বিরোধীতা করে তাতে আমারকি হবে। বরং একজনের বিরোধীতাকেও খুব বড় জিনিস বুঝবে। দিয়াশালই এর একটা কাঠি সমগ্র দুনিয়া কে জালাতে পারে। ঠিক ঐরূপ, একজন ব্যক্তিও দুনিয়াব্যপী ফিতনা খাড়া করতে পারে।

১১। নিজের কামকরনেওয়ালা সাথীদের সহিত সবসময় জুড়ে থাকবে এবং তাদেরকেও নিজের সঙ্গে সবসময় জুড়ে রাখবে। অপরকে জোড়া যতনা জরুরী তার চেয়ে বেশি জরুরী নিজের কামকারনেওয়ালা সাথীদের জোড়া।

১২। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন স্থানের কাজের তরীকা কমবেশি হতে পারে। ইহার জন্য একস্থানের কামকরনেওয়ালা অন্যস্থানের কামকারনেওয়ালার উপরে যেন এতেরাজ না করে। এতে না তার এসলাহ হবে, না তাদের। বরং নিজের মধ্যে এ তেরাজের জজবা বাড়তে বাড়তে দুশমানি ও বদলা নেবার জজবা পায়দা হবে। তারপর অহঙ্কার ও বড়ত্বের জজবা পয়দা হয়ে যাবে। তখন এইরূপ ব্যক্তি শুধু দাওয়াতের কথার মধ্যে ও সুরতের মধ্যে ফেঁসে থাকবে। হকীকত থেকে মাহরুম হয়ে যাবে।

১৩। একস্থানের বসবাস কারনেওয়ালা বন্ধু যদি অন্য কোনস্থানে যায় তো

ওখানকার পুরাতনদের নিয়ে মাশওয়ারা করে কাজ করবে।

১৪। যদি অন্যস্থানের সাথীদের সহিত কোন ব্যাপারে মতভেদ হয় তখন ঐমতভেদ আপোসের মাশওয়ারাতেও যদি দূর না হয় তখন আসল মুরুব্বীদের দিকে (নেজামূদ্দিন ওয়ালাদের) ফিরে যাবে। কিন্তু আপোসের মধ্যে মহব্বতের সহিত মিলেজুলে থাকবে। একে অপরের প্রতি নারাজ যেন না হয়। একে অপরের বিরুদ্ধে কোন কথা যেন বায়ানের মধ্যে না বলে।

১৫। সবচেয়ে ভাল ঐ ব্যক্তি যে হেকমতের সহিত ও ভালো আখলাকের সহিত প্রত্যেককে নিজের সঙ্গে জুড়ে রাখবে।

১৬। তারপরের কম দরজা ঐ ব্যক্তির হয়ে যে প্রত্যেকের সঙ্গে জুড়ে চলবে। আর এই দুটো কাজ সেই করতে পারবে যার মধ্যে বিনয় ও নম্রতা থাকবে।

১৭। আমাদের কাজের মধ্যে আখলাক আছে। নমনীয়তা অর্থাৎ নিজেকে ছোট বানিয়ে বলা যার জন্য প্রত্যেকেই এই কাজের সঙ্গে জুড়ে যায়। শয়তান এই কাজের পুরাতনদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দুশবনিপয়দা করার চেষ্টা করে। আর উহা ওসুলের রাস্তা দিয়ে পয়দা করবে। একে অপরকে অসুলের খেলাফ বলতে থাকবে। অথচ সবচেয়ে বড় অসুল আপোসের জোর যদি হইা না থাকে তবে কোন অসুলই চলবে না।

১৮। সব থেকে বড় বেঅসুলী আপোসের বিভেদ। হুঁশিয়ার ঐ ব্যক্তি যে নফসের এসলাহ থেকে গাকেল হয় না ও শয়তান ও নফসের ধোঁকায় আসে না। বরং দুনিয়াদারী থেকেও ধোঁকা খায় না।

১৯। ভাল আখলাখওয়ালা ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যেককে নিজের সঙ্গে নিয়ে চলবে। চাই সপক্ষের হোক আর বিপক্ষের হোক আমীর হোক আর গরিব হোক। বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যে বর্তমান অবস্থায় আল্লাহয় কি হুকুম তা সে জানে এবং সুযোগ বুঝে এবং মানুষ চেনে। আল্লাহ রেজাবন্দী সত্যিকারে তালেব হয়ে থাকে। আমরা সবাই কাঁটা। মজবুত ঐ ব্যক্তি যে মৃত্যু পর্যন্ত এই কাজের উপরে জমে থাকে। চাই কেহ তার কদর করুক। আর নাই করুক। উহার উপর ভাল গুমান রাখুক আর নাই রাখুক। চাই এই মোবারক কাজের জিম্মাদার মজুরীরাও উহার উপর বদগুমান হয়ে থাক। কিন্তু সে কাহারও উপর বদগুমানি করবে না। তাই সবাই তাকে ছেড়ে দিক, কিন্তু সে কাউকেও ছাড়বে না "হাম না ছেড়েঙ্গে কিসিকো চাহে হামকো

জমানা ছোড় দে”। (আমি কাউকেও ছাড়ব না, চাই দুনিয়া আমাকে ছেড়ে দিক।) উহা আম্বিয়া (আঃ) দের শিফাত। এই জন্য এই কাজ বুজরুকদের নিসবতে করব না। (অর্থাৎ তারা এই কাজ করছে বলে আমি করব তা নয়) এমন কি উহাদের বলার নিসবতে আমি করব না। আমি আল্লাহও রাসূল (সাঃ) এর নিসবতে কোরবো। তাঁদের হুকুমের নিসবতে এই মোবারক কাজ কোরব। কুরআন ও হাদীসের আয়াতের মধ্যে চিন্তা ফিকির করতে থাকবে যে এই কাজ কতটা ফরজে আইন এবং কতটা জরুরী। আল্লাহওয়ালার নিকট দুআ ও কান্নাকাটির দ্বারা এই কাজকে নিজের উপর খোলাব। ব্যস, আল্লাহতায়ালা যার উপরে এই কাজকে খুলে দিবে সেই ব্যক্তি এই কাজকে বুঝতে পারবো। চাই সে বয়ান করতে জানুক আর না জানুক; মূর্খ হোক আর আলিম হোক।

(ফারাদ ওয়াস্‌মালাম সঈদ আহমাদ খান সাহেব)

-ঃ মাওলানা সঈদ খাঁন সাহেবের নসীহত ঃ-

যে ব্যক্তি নিজের এসলাহকে সামনে রেখে অপরের উপর মেহনত করবে তার এসলাহ হয়ে যাবে এবং ঐ ব্যক্তি নিজেকে দ্বীনের উপর চালাতেও পারবে এবং দ্বীনের মেহনত করার যোগ্যতা তার মধ্যে আসতে থাকবে। কিন্তু শর্ত হচ্ছে এই যে তাকে দ্বীনের মেহনতের সহীহ উসুল পালন করতে হবে। যদি উসুলের মধ্যে ভুল হয়ে যায়। তো না নিজের জীবন বানাবে না সহীহ মেহনত তার জীবনে আসবে। উসুলের লেহাজ করা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। উহা ব্যতি রেকে ফিতনার দরজা খুলে যাওয়ার ভয় আছে। আল্লাহ আমাদেরকে হোকাজত করুন আমীন।

১। ঐ সমস্ত উসুলের মধ্যে একটা কথা এই যে, মানুষের থেকে ফায়দা ও খাবার খেয়াল যেন না হয় বরং সবসময় মানুষকে ফায়দা পৌঁছাবার জজবা যেন হয়। বিনা নিয়তে যদি কোন ফায়দা হাসিল হয়ে যায় তখন উহার মধ্যে নিজের নফসকে খারাপ হয়ে হবার রাস্তা থেকে বাঁচাবার উসুল এব্যক্তির করতে হবে।

২। কোন কাজ বিনা মাশওয়ারার করার হিম্মতই যেন না হয়। উহার খারাবীর ভয় বেশি আছে। ভালোর আশা খুব কম। ইজতেমারী কাজে মাশওয়ারা করা ওয়াজিব। এবং নিজের ব্যক্তিগত কাজেও পুরাতন তবলীগওয়ালা যার মধ্যে তবলীগের গিরে লেগে গেছে তার সঙ্গে মাশওয়ারা করে চলা মুস্তেহাব ইহাতে অনেক খারাবী ও ফিতনা থেকে নিজের হেফাজত হবে।

৩। সমস্ত মুসলমানের উপর থেকে নিজের দিলকে সবসময় সাফ রাখার চেষ্টা করবে। নচেৎ দিলের কিনা (অন্তরের রাগ) নিজের নফসের এসলাহের জন্য বাধা হবে। অন্যায় ও জুলুমকারীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা ও এহসান করে (দয়া দাক্ষিন্য করা) যেতে হবে। ইহা নবী (সাঃ) এর সুন্নত। এবং নফসের এসলাছের জন্য এবং উন্মতের মধ্যে একতা পয়দা করার জন্য বড় গুরুত্ব রাখে। ইহার থেকে বেশি আসর করার জিনিস আর কিছুই নেই।

৪। নিজের সময়কে সহীহ ভেবে কাটাতে হবে। লাইয়ানী থেকে বাঁচতে হবে।

৫। নিজের আমিরকে সর্বাবস্থায় মেনে চলা। চাই দিল চাক আর না চাক এবং দিলের মধ্যে আমিরের ইজুতও সম্মান ও উহার উপর ভালো আর দা রাখতে হবে। আমিরের ভুল এটাই কারনে আমীরের উপর বদগুমান না হওয়া। কারন ভুল সব সময় হতে পারে একমাত্র নবী ও ফিরিস্তা ছাড়া। ভুল ত্রুটির কারনে মানুষের আল্লাহর নৈকট্য থেকে দূরে সরে যায় না। বরং উহার উপরে তার ওয়বা

ও ইস্তেগকার করা তাকে আল্লাহর আরও বেশি নিকট করে দেয়।
৬। নিজের জানের সঙ্গে নিজের মাল খরচ করাও কে নিজের জন্য সৌভাগ্য জানা দরকার। কারণ মালের মুহাব্বত নফসের ইসলাহের মধ্যে রুকাওয়াট (বাধা) হয়ে যায়। বরং নফসকে দুনিয়াতে ফাঁসিয়ে দেয় এবং বহু ঘটনা ঘটিয়ে দেয়। বরং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা অন্য রাস্তায় খরচ করার বা নিজের প্রয়োজনে খরচ করার চেয়ে যেন মাহবুব বেনে যায়। নিজের লজুতের পেছনে এমন কি নিজের হাজতকে কম করে চলতে হবে ও আল্লাহর ফরমান ও তরিকার উপরে চলতে খরচ করে যেতে হবে। এছাড়া মালের ফিতরা ও মালের মহব্বত থেকে বাঁচা মুশাকিল। ইহা ঐ জিনিস যাহা সাহাবীদের খাসগুনের মধ্যে বয়ান করা হয়।
৭। আমিরের ধমক ও গুস্সাকে (রাগ) নিজের সংশোধনের জন্য ভালো জানবে। এ অনেক বড় সুন্নাত খোলাফাতে রাশোদিনদের জমানা পর্যন্ত চলেছিল। এছাড়া শিক্ষার ব্যাপারে উস্তাদদের এবং জিকরুল্লাহের ব্যাপারে বুজুগানে দ্বীনদের এ সম্বন্ধে লাখো ঘটনা পাওয়া যাবে। যারা এ সমস্ত ব্যাপারে বড়দের ডাঁট (ধমক) কে বরদাস্ত করেছিলেন। হয়রত উমার (রাঃ) এর দুররা (হান্টার) তো বিখ্যাত ছিল। কিন্তু আজ উহার সহ্য করার ক্ষমতা উম্মতের মধ্যে নেই। আমি দেখেছি মাওলানা ইলিয়াস (রঃ) কে তিনি আমাদের মধ্যে অনেককেই কানধরা করিয়েছিলেন। ই রকমভাবে কান ধরা করিয়েছিলেন যেমন মস্করের মধ্যে হাফজনাহের বাচ্চাদের কান ধরায়। তিনি অনেক সময়ে মসজিদ থেকে অনেককে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতেন। দুইতিনবার এই রকম বের করে দেওয়ার পরও যে চলে যেত না তাকে বুকরে জড়িয়ে ধরতেন। মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) এর ডাঁট (ধমক) বড় কঠিন ছিল। এরকম করা ও বেশি ছিল। বান্দাকে (সঈদ খাঁন) একবার এক ব্যাপারে বড় মেরেছিলন যার ফলে হযরতের মহব্বত আরও বেড়ে গিয়েছিল। এবং হজরতের সঙ্গে তায়াল্লুক আরও বেড়ে গিয়েছিল। হয়রত মাওলানা ইউসুফ (রহঃ) একবার পুরাতনদেরকে এত বেশি ধমক দিয়েছিলেন যার কারনে অনেক পুরাতন নিজেদের বিছানা বেঁধে নিয়েছিলেন এবং অনেকে চলে গিয়েছিলেন। পরে তাঁর রাগ ঠান্ডা হবার পর তারা ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান ছিলেন তারা বিছানা গুটান নি, বিছানা রেখে ছিলেন এবং বলেছিলেন চাই আমাদের মারা হোক কিংবা বের করে দেওয়া হোক আমরা কেহই এখান থেকে যাব না। আমরা আল্লাহর দ্বীনের জন্য এসেছি। মোটের উপর ইহাও দ্বীনের অংশ। কিন্তু আজ রেওয়াজের মধ্যে নেই। বিনা ধমকে বিনামারেতে শুধু ইশারার দ্বারা

কেউ কেউ চলে, কাহারও কাহারও এশলাহ হয়।
৮। নিজেকে নতুন জানা গুনের দিক থেকে। নিজেকে পুরাতন জানা সময় লাগানোর ব্যাপারে । নিজের মধ্যে গুনকে পয়দা করার ব্যাপারে এই রকম বোঝা দরকার। যাকে আমির ধমকাতে পারে না সে হচ্ছে নতুন। যাহাকে আমীর সবখানে পাঠাতে পারে না সেও নতুন। যাকে আমির প্রতি সময় প্রতিটি কাজের জন্য প্রত্যেকের সঙ্গে পাঠাতে পারে না সে ও নতুন, পুরাতন নয়। যাকে আমীর ভুলের উপরে টুকতে পারে না সেও নতুন ওদের সংশোধন বড় মুশকিল। তবে আশা করা যায় আল্লাহর রাস্তার বেরুতে বেরুতে ও মেহনত করতে করতে ও কুরবানী দিতে দিতে ইনশা আল্লাহ এই গুনের উপরে আসতে পারে।
৯। নিজেকে সবসময় তলব করনেওয়ালা (শিক্ষার্থি) বানাবে। নিজেকে কখনো মাতলুব বানাবে না। অর্থাৎ আমাকে তলব করা হবে, আমাকে চাওয়া হবে তবে আমি করব এরকম কখনো মনে করবে না। মানুষের একরাম করব মানুষের দ্বারা একরাম করাব না। বরং যদি কোন ব্যক্তি নিজের নেক আখলাকের গুনে আমার একরাম করে তখন আমি নিজেকে উহার যোগ্য বুঝব না। বরং ভয় করব। কারণ বহু লোক একরামের কারনে খারাপ হয়ে গেছে। এবং নিজেকে নিজে বড় মনে করে। এই দিকে যেন নিজের ধ্যানই না যায়। যে মানুষ আমার একরাম করবে। যদি কেহ একরাম করে তা হলে দিলের মধ্যে আমি এই খেয়াল করব যে এ আমার খারাবিগুলো জানে না এ জন্য এ আমার একরাম করছে। যদি ও আমার খারাবীগুলো জানত তবে কোনদিনই আমার একরাম করত না। আর এ কথাও জানবে। এই একরাম শুধু দাওতওয়ালা আমলের। আমি একজন ব্যক্তি। এই একরাম আমার নয়। আর ব্যক্তি আমলের অধীনে। যদি আমল ছুটে যায় তো ঐ ব্যক্তির কেউ একরাম করবে না। যদি নিজের খারাবীর উপরে সবসময় নজর থাকে কবরও আখেরাতের ফিকির থাকে তো নিজেদের একরাম করানোর দিকে ধ্যানই যাবে না। আখেরাতকে সব সময় চিন্তা করবে এবং মৃত্যু সর্বদা মনে করবে। নিজের ছোট থেকে ক্ষুদ্রতর দোষের উপরে আল্লাহর পাকড়াও কে সর্বদা ভয় করবে। আর অপরের বড় থেকে বৃহত্তর দোষের উপরে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবে - এই খেয়ালটা রাখবে।
১০। নিজেকে পুরা আলামের জিম্মাদার জানবে। কাল কিয়ামতের ময়দানে পুরা আলম সম্বন্ধে আমাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে তুই কেন মেহনত করিস নি। যদি মেহনত করতাম দুয়িাতে দ্বীন ছড়াতো, বদদ্বীনি খতম হত। এবং আজ পুরো

আলমের মধ্যে যে বদদ্বীনী চলছে তার উপরে নিজের দিলের ভেতরে দুঃখ-ব্যথা পেয়ে বেচাইনী হতে হবে। এবং উহা মেটাবারও চিন্তাও তদবীর করতে হবে । ও দিলে দিলে আল্লাহর নিকট দোআমাগতে হবে।

১১। পুরাতন হজরতরা যখন নিজেদের পুরানো বুঝবে তখনই জোড়ের জায়গায় তোড় পয়দা হবে এবং বানবার ও ঠিক হবার বদলে বিগড়াতে থাকবে। এবং নিজের বেউসুলীর উপরে নিজে নিজেই ঢাকা দেবার চেষ্টা করবে। যার ফলে ঐ সমস্ত বেউসূলী গুলি উহার মধ্যে মজবুত হয়ে যাবে। তখন কেহ যদি ঐ সময় তার বেউসুলী গুলি রুখবার চেষ্টা করে তখন কাজ থেকে সরে যাবে। আর ঐ সময়ে অন্য লোকেরাও তার দেমাগকে খারাপ করতে লেগে যাবে এবং তারা বলবে তুমি পুরো জীবন এই কাজে লাগিয়ে দিলে ও জানমালকে কুরবানী করে দিলে কিন্তু তারা জিম্মা-দাররা তোমার কদর করলে না। জেনে রাখ ইহা বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিও বড় পরীক্ষার সময়। তবে ভয়ের ঘাঁটি আরো আছে। যেমন তবুকের যুদ্ধের সময় তিন সাহাবীর উদাহরণ।

১২। যখন তবলীগের কাজের সঙ্গে লাগনেওয়ালা ধনী লোকদের সহিত গোপনে গোপনে মিলে নিজের সমস্যাকে সমাধান করার জজবা দিলের মধ্যে পয়দা হতে থাকবে তখন সৃষ্ট বস্তুর উপরে ও পরের মালের উপরে দৃষ্টি জমে যাবে। এবং কলেমার শুধু বোল থেকে যাবে। এবং বক্তার মত বেনে যাবে। তখন দুআর মধ্যে জান থাকবে না। তখন রাহাত, আরাম ও জরুরতকে পুরা করার জন্য নিজেকে অপরের মোহতাজ জানবে। মরার ইচ্ছে তখন খতম হয়ে যাবে। বেঁচে থাকার ইচ্ছে বাড়তে থাকবে। জেনে রাখ ইহাও খুব ভয়ের ঘাঁটি। আল্লাহওয়ালা বান্দাকে ও সমস্ত দোস্তবর্গকে যেন হেফাজত করেন। এরকম অবস্থা আসতে থাকলে তখন নিজেকে উসুলের উপর জমাতে হবে। কুরবানীর উপর আগে বাড়তে হবে। মৃত্যু পর্যন্ত কাজে লেগে থাকতে হবে। আল্লাহর কাছে দোআ মাঁগতে থাকবে। নচেৎ শয়তান ধোঁকা দিয়ে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দেবে। এত বড় নেয়ামত থেকে আমাকে আপনাকে বঞ্চিত করে ছেড়ে দেবে।

১৩। এই মোবারক কাজ ঐ সমস্ত লোকের উপরে খুলবেন এবং উহার আজমত তাদের দিলে বসিয়ে দেবেন যে ব্যক্তি সব সময় নিজেকে নতুন ভেবে চলতে থাকবে ও শিখবার যেহেন মৃত্যু পর্যন্ত রাখবে। এবং আমিরে পুরোপুরি এতে আত করবে। এমন কি আমিরের হাতেই নিজেকে সৌপর্দ করে দেবে। এবং

নিজের কাজকে মাশওয়ারাওয়ালাদের অধীনে করে দেবে। এবং বিনা মাশওয়ারায় চলাকে নিজের জন্য পুরোপুরি খারাবী মনে করবে এবং ঘরওয়ালাদের অনুসরন করবে না এবং উহাদের তিরস্কারের ও ভয় করবেনা এবং উহাদের প্রতিটি হাজতকে পুরো করা জরুরী মনে করবে না। নচেৎ বিবিবাচ্চা এ রাস্তায় রুকাওয়াট (বাধ্য) বেনে যাবে।

ফাকাদ ওয়াস্‌সালাম বান্দা সঈদ আহমাদ খাঁন ২২ শে রজব ১৩৯০ হিঃ

২০০২ সালের ভারতবর্ষের কর্মীদের জোড় মাওলানা সা'দ সাহেবের দাওয়াত ও তবলীগের ওসুল সম্পর্কে আলোচনা

ইজতেমায়াত (আপসের জোড়)

আল্লার সাহায্য আসিবার প্রথমও প্রধান জরিয়া বসিরাত ও ইসতেক্কামাত। অর্থাৎ অন্তরের ইয়াক্বীন ও জমে যাওয়া।

যদি এই মোবারক কাজের স্থানে ও কাজের মারকাজে একতা না হয় তো আগে গিয়ে মতভেদ বাড়বে। এখানকার সমস্ত কথাকে (অর্থাৎ দিল্লি মারকাজে) আমল করবার নিয়তে নিতে হবে। যখনই এখানে আসা হবে তখনই পিছনের কথাকে ছেড়ে আগের কথা হবে। এই কাজ ও আগে বাড়ার জন্য। যখন আগের জন্য যাহা বলা হবে তা করতে হবে। সিড়ির ওপরে যানেওয়ালা পিছনের সিঁড়িকে ছেড়ে আগে বাড়ে। এটা যেন না হয়, যা করার করে যাও, শোনার কথা শুনতে থাক। মানার মধ্যে উন্নতি আছে।

এই ইয়াক্বিনের সঙ্গে এই মোবারক কাজ করতে হবে। যে আল্লার সাহায্যে কাজের ওপরে অতি প্রথম বুনিয়াদ। এর দ্বারা কাজের মধ্যে জমাও হবে। নচেৎ ছোট ছোট কথার কারনে এই মোবারক কাজ ছেড়ে দেবে। যদি মোবারক কাজের ওপরে আল্লার সাহায্যের ইয়াক্বিন না হয় তো ইসতেক্কামতও পয়দা হবে না কাজ করনেওয়ালা যদি এই জেহেনওয়ালা হয় যে, আমাকে জিজ্ঞাসাকরা হোক আমাকে ডাকা হোক, তাহলে, আমি কাজ করর নচেৎ ছেড়ে দেব। এই জেহেন সম্পূর্ণ ভুল। এই কাজে নিজের হাজত। এই কাজ হতে আমি বেপরোয়া হতে পারব না। প্রতিটি মানুষ এই মোবারক কাজকে নিজের কাজ বানিয়ে করুক। হইাওরার কাজ নয়, যার কাজের কাজ নয়, বরং এটা আমার নিজের কাজ। আল্লার ওয়াদা পুরা হবার জন্য দিলের মধ্যে ইয়াক্বিন পয়দা হওয়া প্রথম শর্ত। আল্লার দিকে ডাকতে হবে, রাসূল (মাঃ) এর দিকে ডাকতে হবে, দ্বিনের দিকে ডাকতে হবে। দায়ীর কাজ সোজা রাস্তার দিকে পথ দেখানো। এই ইয়াক্বিনের সঙ্গে পথ দেখাতে হবে যে আমি তোমাদিগকে সোজা রাস্তার দিকে ডাকছি। ইহার দ্বারা কাজের উপরে কর্মীর ইয়তেকামাত (কাজের উপরে জমা) ও নসীব হবে। কাজের উপরে জমে যাওয়ার উপরে ভাল ফল প্রকাশ হবে।

দা'য়ী তো প্রতি অবস্থাই কামিয়াব। চাই তার কথা শোনা হোক নাই হোক।

মানুষের না মানাতেও কাজের উপরে বাধা এলে কর্মীর মধ্যে যেন নিরাশী পয়দা না হয়। হক্কের হক্ক হওয়ার দলিল এটাই যে, হক্কের রাস্তার উপরে বাধা এলে কর্মীর মধ্যে যেন নিরাশা পয়দা না হয় যে হক্কের রাস্তার উপরে বাধা আসবে। হক্কের উপরে ইনকার করা হবে।

কাজ করনেওয়ালার যখন কাজের উপরে বাধা আসবে তখন নবীদের উপরে যে সমস্ত বাধা এসেছিল তাকে সামনে রাখবে। হুজুর (সাঃ) কে নিজের লোক দ্বারা ও অপর লোক দ্বারা কষ্ট বেশি পেতে হয়েছে। সবথেকে খারাপ হতে খারাপ অবস্থার উপর হুজুর (সাঃ) কে রাখা হয়েছিল। এই ধ্যান কাজ করনেওয়ালা কর্মীকে রাখতে হবে। এর দ্বারা সবর ও ইসতেকামাত (জমাও) হাসিল হইবে। মানুষের অবস্থা এই কাজের অধীনে কিন্তু এই মোবরক কাজ অবস্থার অধীনে নয়। যে ব্যক্তি অবস্থার অধীনে হয়ে এই কাজ করবে সে ব্যক্তি কাজ ছেড়ে দেবে। আল্লাতায়ালা বিভিন্ন অবস্থার মাঝখানে ফেলে কর্মীর পরীক্ষা লইবেন। সব থেকে প্রথম ভয়ভীতি দিয়া পরীক্ষা নিবেন। নবীদিগকে সব থেকে বেশি বিভিন্ন অবস্থার ভিতরে ফেলে পরীক্ষা লইয়াছেন। তার মতলব ইহা নয় যে, তাদের সহিত আল্লার সাহায্যে থাকে নাই। বিভিন্ন অবস্থার মাঝে ফেলে আল্লাহ কর্মীকে দেখিবেন উহার মধ্যে ফেলিয়া আল্লাহ কর্মীকে দেখিবেন, উহার মধ্যে ওসতেকামাত কতটা। বিভিন্ন অবস্থার মাঝে ফেললে এসতেকামাও কতটা আছে তা পরিস্কার বোঝা যাবে। (কোরআন) তারা আমান্না বলল এবং উহাদের পরীক্ষা লওয়া হবে না। যদি এহা ধারনা করে তো সম্পূর্ণ ভুল হবে। আমি নিশ্চয় তাদের পরীক্ষা নেব। থেকে কতটা আমার পথে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী।

আমাদের এই কাজের উপরে পুরোপুরি বসিরত ও ইয়াক্বিন হতে হবে। আমরা এই মোবারক কাজকে কাজের জন্যই করব। অন্য কোন কারনে করব না। সাহাবায়ে কেরাম হুজুর (সাঃ) এর পরেও এ কাজ করেছেন। এই নয় হুজুর দুনিয়া থেকে চলে গেলেন সাহায্যকারী চলে গেল তো কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহর সাহায্য যেরকম ভাবে নবীদের সঙ্গে ছিল, ঠিক সেইরকম ভাবে উম্মতের সঙ্গে প্রতিটি যুগেতে থাকবে।

আল্লার সাহায্যে আসিবার প্রথম কারণ বসিরত (দিলের ইয়াক্বিন) এবং এসতেকামাত (জমে যাওয়া) আর দ্বিতীয় কারন কুরবানী এবং এখলাস (এই জন্য) নিজেকে নিজে আল্লার নিকট কবুল করাও কুরবানী দ্বারা। এই নয় যে, ব্যক্তিগত আপনি আমার ভাব ভালোবাসাওয়ালা, মাশোয়ারাতে আপনাকে আগে

ডাকা হবে এবং আগে করা হবে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। মালের কারনে ভাবভালোবাসার কারনে যে গরজওয়ালা হবে। (অর্থাৎ নিজ স্বার্থে কাজ করবে) এই সমস্ত লোক ঠিক কাজের সময়েও এই কাজকে ছেড়ে দেবে। যে ব্যক্তিকে তার আমল পেছনে ফেলে দেবে। সেই লোককে তার বংশের কারনে কেমন করে আগে বাড়বে। দুনিয়ার ক্ষেত্রে তো মানুষ ভাব ভালবাসা ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দ্বারা আগে বেড়ে যাবে। কিন্তু দ্বীনের উপরেতে কুববানীর দ্বারাই আগে বাড়বে। টাকা পয়সার দ্বারাই রাজত্ব বানিয়ে এবং টাকা পয়সার দ্বারাই রাজত্ব। কিন্তু দ্বীনের মধ্যে কবুলিয়াত ভাঙ্গবে আসমান থেকেই আসবে। কবুলিয়াতের ইলান আসমানে হয়। জমিনে নামে। তুমি ইখালাসের সঙ্গে চেষ্টা করে যাও, তুমিই আগে বেড়ে যাবে। ভাব ভালবাসার কারনে এই কাজে কেউ আগে বাড়তে পারে না। বরং কুরবানীর দ্বারা আগে, বেড়ে যায়। ভাব ভালোবাসার কারনে নৈকট্য মিলে যাবে। সেহেল বিন আমের, হাশেন বিন হিশাম (রাঃ) ইহারা হজরত ওমরের নৈকট্য লাভ করেছিল। কিন্তু যখন কুরবানীওয়ালারা আসল তখন তাহাদিগকে পিছনে হাটতে হল। এমনকি শেষ পর্যন্ত পিছোতে পিছোতে কামরার বাইরে হয়ে গেল। একজন অপরজনকে বললো আমাদের মত লোক হয়েও পিছনে চলে গেলাম। কিন্তু তাহারা তঐ জমানার লোক ছিল। ঐ পিছে হয়ে যাবার দোষ নিজের উপরে নিল। আমিরের উপর দোষ রাখল না। তারপর সবাই যখন চলে গেল তখন তাহারা হজরত ওমর (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিল পিছিয়ে দেবার কারন কি। হজরত ওমর বললেন তাহাদের সামনে তাকাজা দেওয়া হয়েছিল তারা পুরো করেছিল। তোমরা পুরো কর নাই। তোমরা পিছে হয়ে গেলে। তারা আগে বেড়ে গেল। আমাদেরও সব সময় এই ফিকির রুখা উচিত যে, আল্লাহ আমাকে কবুল করে নিক। ইহা যেন না হয়, সে আমাকে ডেকে নেবে, আমাকে নিকটে করে নেবে, আমাকেও জিজ্ঞাসা করবে। এ সমস্ত মোনাফেকদের মেজাজ। ইমানওয়ালাদের মেজাজ - নিজেকে নিজে আগে করা ডাকার অপেক্ষা করবে না। আল্লাহার নিকট নিজেকে নিজে কবুল করাও। কেউ মারাওয়ালাদের জন্য করবে। কেই জিহাদের জন্য করবে। অর্থাৎ তাহাদের খুনী সন্তষ্টের জন্য জিম্মাদারের করা - ইহা ও এক প্রকার শোরেক। এই জন্য কুরবানীওয়ালা সবসময় আগে বাড়বে। ভাব ভালোবাসার কারনে আগে বাড়নেওয়ালারা পিছে ছুটে যায়। ভাব ভালোবাসাও খতম আর তারও গায়েব হয়ে গেল। পুরো জীবনেই আল্লাহর কাজের তাকাজা আছে। আল্লার কাজ আল্লার মতই হয়, তিনি যে কারো দ্বারা

কাজ নিতে জানেন। আমাকে এই মোবারক কাজের প্রয়োজন আছে। এই মোবারক কাজের আমাকে প্রয়োজন নেই। এই কাজ মোহতাজ বেনে করার জজবা বাড়িয়ে দেয় অর্থাৎ বন্দেগী পয়দা করে দেয়।

তৃতীয় জারিয়া আল্লাহ সাহায্য কে নামাবার ইজতেমায়াত অর্থাৎ আপাষে জোড় - যদি রোজা নামাজ ও দ্বীনদারী সবই যাকে কিন্তু ইজতে মায়াত আপোষে জোড় না থাকে তো কোন লাভ নেই। হক্ক বাতিলের নীচেই দেবে থাকবে। ইজতেমায়াত অর্থাৎ দিনগুলো সব এক হওয়া। একেই জামাত বলে। শরীর গুলি একত্রিত হয়েছে কিন্তু দিল সব কেটে আছে তো এর নাম ভীড়, জামাত নয়।

নবীর ফিকির হলো এতগুলি বাতিল এক কাছে জমা হয়েছে। জানিনা এরা কি ঘটাবে। অহী নাজিল হল আপনি কোন ফিকির করবেন না, উহাদের শরীর গুলো জমা হয়েছে কিন্তু দিল কেটে আছে। (বাতেল সবসময় দিলের দিক থেকে কেটে থাকে) এরা আপনার কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। আমাদের নামাজ আমাদের দুআ, আমাদের তারা লুকমা আল্লাহ আরশ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেও যদি আমাদের দিল আপোষে একে অপরের সহিত কেটে থাকে তো আল্লার সাহায্য কিছুতেই নামবে না। এবং হক্ক সব সময় বিজীত থাকবে আর বাতিল জয়ী থাকবে।

ইজতেমায়েত তখনই কায়েম হবে, যখন আমরা নিজকে ছোট বানাব। বড় বানাতে গেলে ইজতেমায়েত কায়েম হবে না। দুজন মানুষ মসজিদে আছে। নামাজের মধ্যে প্রত্যেকে চাইছে আমি নামাজ পড়াবো তো জামাত কখনই, বানবে না।

এজতেমায়েত (অর্থাৎ আপোষে জোড় কায়েম হবার সব থেকে বড় জারিয়া সাথীদের দোষকে চশমপুশী করা। সাথীর উপরে সফকত করা, সাথীকে নিকটে করে নেওয়া সাথীর জন্য নরম হয়ে যাওয়া। এ বড় জারিয়া কঠিন মেজাজওয়ালা থেকে এই জিনিসটা হবে না। কঠিন মেজাজওয়ালা হলে উম্মত নবীর থেকেও আলাদা হয়ে যাবে। সাথীর দোষগুলিকে ধরলে এবং কঠিন্য বজার রাখলে এজতে মায়েত অর্থাৎ আপোষে জোড় বাকিই থাকবে না। বরং কায়েম হতেই পারে না।

বড়রা ছোটদের ভুল ধরলে ছোটদেরকে জেদী বানিয়ে দেয়। আর তাদের সংশোধন ও হয় না। হজরত ওমর (রাঃ) দেয়াল পেরিয়ে প্রবেশ করবো সময়ে লোকদের সরাব পান করতে দেখলেন তাদেরকে দোষী সাবস্ত্য করলে তো তারা হজরত ওমরের দোষগুলি গুনিয়ে দিল। হজরত ওমর (রাঃ) কাঁদতে ফিরে চললো।

ওসুল সাথীদের উপরে আনা যায়, ছাপানো যায় না। জিম্মাদার নিজে

ওসুলের পাবন্দী করবে ও অপরকে তার গীব করবে। (কুরআন) নবীন আপনি নিজে খোদ কষ্ট উঠান আর অপরকে তারগীবদেন। কষ্ট উঠানো মানে নিজেকে কষ্টে ফেলা নয়, বরং আমলের জন্য নিজেকে লাগানো।

যদি জিম্মাদার ওসুলকে পাশ করানো ও সাথীদের কম বেশীকে ধরতে লেগে যায় তাহলে সাথীরা, তার সাথে থাকতে না। অপরকে কষ্টে ফেলা মানে তুমি এই টা করো, সে ঐ টা করুর অর্থাৎ জিম্মাদার বাদশা ও সাথীরা প্রজা। ইহা নয় ইনিই ফয়সাল তার এই মোর্ত্তবা, তারপর অপরের মোর্ত্তবা বরং সকলেই সাথী। সকলেই কর্মী।

কাজ করনেওয়ালা অপর কাজ করনেওয়ালাকে সাথী বানিয়ে নিয়ে চলবে। এ নয় যে, নিজের অধীনস্থ বানিয়ে নেবে। ফয়সাল নিজে সুরাওয়ালাদের পাবন্দ নয়। আমাদের এখানে কেউ শায়েখ নয়। এই মোবারক কাজকে শায়েখ বানিয়ে চলবে সেই হচ্ছে কর্মী।

নিজেকে ওসুলের, পাবন্দ করার সাথে সাথে সাথীদেরকে ওসুলের উপর আনো। তাদের উপরে হুকুম চালিয়ো না। তাদের দিলকে জয় করো। তাদেরকে সাথে নিয়ে চলো ইহা নয় যে, তাদের কে শুধু ফয়সালা বা হুকুম শুনিয়ে দেওয়া। আমরা সাথীদের বে-ওসুলির উপর ধরপাকড় করব না। বে-ওসুলি তো মানুষ হবার কারনে হয়।

তাদের বে-ওসুলি দেখে এমন হয়ে যাও, যেন দেখই নাই। আর এখানে আমাদের এই অবস্থা যে, আমরা সেই মুহূর্তেই বে-ওসুলিকে অপর পর্যন্ত পৌঁছে দিই। এই জন্যই বে-ওসুলি দুনিয়াতে ছড়াচ্ছে। বাতিলের মৃত্যু বাতিলের চর্চা ছেড়ে দিলে হয়। আলোচনা করলে ভালো জিনিসের করো।

সাথীদের বে-ওসুলিকে ছোট করো। ইহা যেন না হয় তার বে-ওসুলিকে অপরের কাছে বলে বলে উহার গুরুত্বকে বাড়িয়ে দেওয়া এই জন্যই যে, সবাই জানুক এই ব্যক্তি এই খারাপ কাজ করেছে।

সাথীর বে-ওসুলিকে তার কুরবানীর জন্য গোপন কর। সাথীর বে-ওসুলি বায়ান করলে এক তো তার মধ্যে বে-ওসুলি করার হিম্মত পয়দা হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত তার তো বে-ওসুলি বাকি থেকেই যাবে, দূর হবে না। হজরত ওমরের মজলিশে একজন বায়ু সরে গেলে তাতে তাঁর খুব রাগ হলো। হজরত ওমর (রাঃ) হুকুম দিলেন যে এই কাজ করেছে সে এক্ষুনি যেন উঠে ওজু করে আসে এবং কসম দিয়ে দিলেন। তৎক্ষনাৎ হজরত জারির (রাঃ) দাড়িয়ে গেলেন এবং

হজরত ওমরের কানে কানে বললেন, আমির সাহেব বড় ভালো হয় মজলিশের সমস্ত লোকেরা ওজু করে নিক। নচেৎ ও সাথীর দোষ প্রকাশ হয়ে যাবে। এবং সে লজ্জিত হয়ে যাবে। ইহাতে সমস্ত মজলিশ ওজু করলো। হজরত ওমর (রাঃ) হজরত জরির (রাঃ) কে অনেক দুআ দিলেন (হাদীস) আল্লাহ যার সঙ্গে ভাল করার ইরাদা করেন তার সাথে ভালোর পরমার্শ দেবার কর্মীও নিযুক্ত করে দেন। সুতারং একজনের দোষকে গোপন করার জন্য সমস্ত মজলিশওয়ালারা ওজু করলো। আজকের যুগে এই মোবারক কাজ তার সহিহ তারিকা থেকে বহু দূরে চলে যাচ্ছে। আমরা তো শুধু ছোটা ছুটি করাকেই কাজ বুঝে নিয়েছি। না তরাবয়ত এর ফিকির না পাবন্দি করার ফিকির, না সাহাবাদের জীবনীর দিকে ধ্যান আছে। আমরা তো হায়াতুস্ সাহাবা কিতাব কে মোটা কিতাব মনে করে ছেড়ে দিয়েছি। আমি খুব বুঝি। আমাদের মজলিশ ওয়ালাদের হায়াতুস সাহাবা কিতাবের পড়ার দিকে টান নেই। ফাজায়েলে আমল থেকে আমলের দরজা খুলবে, কিন্তু তরবিয়ত হবে হায়াতুস সাহাবা থেকেই।

হুজুর (সাঃ) কে হুকুম এলো নবীজী আপনি উহাদের দোষ গোপন করুন এবং উহাদের জন্য আল্লার নিকট মাফ চান। যে মাফ চাইতে আসে তাকে মাফ করে দেওয়া - ইহা কম দরজার কথা। মাফ করার ব্যাপারে তার জন্য এমন হয়ে যাও যেন তার দোষকে দেখাই হয় নি। এস্তেগফার হচ্ছে সাথীর কম জোরী বা দোষকে খোদার সামনে রাখো। আর গীবত হচ্ছে সাথীর কমজোরী বা দোষকে আপরের সামনে রাখা। গীবতের দ্বারা সাথী আমার থেকে দূরে সরে যাবে। তারপর তাকাজাগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ পুরো হবে না। আসল মুরুব্বি তো আল্লাহু তাবারক ওয়ালা, বাকি শায়েখ ও পীর তো জারিয়া। এই জন্য এস্তেগফার ইহাই যে, আল্লার সামনে কেঁদে কেঁদে সাথীর ইসলাহ ও হিদায়াত চাও।

সাথীকে নিয়ে চলো। ছেড়ে নয়। সাথীর ভুল হলে আমরা সাথীকে ছেড়ে দিই। অথচ ছেড়ে দিলে তার ভুলের সংশোধনের রাস্তাই বন্ধ হয়ে যাবে। বে-ওসুলি করনেওয়ালার সঙ্গে নরম ও ভালবাসার ব্যবহার হতে হবে। কিন্তু আমরা সাথীকে কষ্টে ফেলার মত ব্যবহার করি। ইহার দ্বারা ফল আরও খারাপ হয়ে যায়। এই জন্য সাথীর দোষকে ছোট করো মসজিদের মধ্যে প্রস্রাবকারীর সঙ্গে নবী (সঃ) কেমন ব্যবহার করলেন। লোক-দেরকে তাকে বাধা দিতে নিষেধ করলেন। অর্থাৎ প্রথমে ঐ ব্যক্তি ভুল করে পেশাব করলো এবং এখন নবী (সঃ) তাকে পেশাব করে নিতে এজাজত দিলেন। মানুষদিগকে পানি ঢেলে দিতে বললেন। আর ও

প্রস্রাব কারীকে নরম ভাবে বোঝালেন।

সাথীদিগকে ধরপাকড় করা আমরা কাজ বানিয়ে নিয়েছি। জিম্মাদারেরা সাথীদের দোষকে গোপন করার কারনে আল্লাহ সাথীদিগকে দোষ থেকে পাক করে দেবেন। এবং জিম্মাদারদিগকে আল্লাহ সব থেকে ভাল বদলা দান করবেন। হজরত ওমর (রাঃ) বৃদ্ধ বড়মিয়ার শরার খেতে দেখার ঘটনা ..... হজরত ওমর (রাঃ) বৃদ্ধ বড় মিয়ার কানে কানে বললেন তোমরা ঐ শরাব পান করার ঘটনা আমি কাউকেও বলি নি। এমনকি আমাদের সঙ্গে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ ছিল তাকেও বলি নি। বৃদ্ধ বড় মিয়াও হজরত ওমরের কানে কানে বললেন, আমিও ঐদিন থেকে তওবা করে নিয়েছি। যে অপরের দোষকে অপরের নিকট বলে বেড়ায় আল্লাহওয়ালা তাকে ঐ গোনাহর কাজে মরার আগে লাগিয়ে দেবে। যদি মসজিদে প্রস্রাবকারীকে ডাঁট-ডপট (ধমক) করা হতো তাহলে তার তামিল ও তরবিয়ত বন্ধ হয়ে যেত।

সাথীদের বে-ওসুলিকে সহ্য করো। নবী (সঃ) কত সহ্য করেছেন এমনকি নূতনেরা তাঁর ধৈর্যকে দেখে নবী হবার পরিচয় বুঝল। অর্থাৎ ইনিই যে সত্য নবী এই ধৈর্য্য তাঁর আলামত। নূতনরা ইচ্ছা করে মূর্খতার সঙ্গে ও বাড়াবাড়ির সহিত খুব খারাপ ব্যবহার করে নবী (মঃ) এর পরীক্ষা করত। পুরাতনরা যখন নুতনদের বেউসনীকে সহ্য করে নাই তখন - আল্লাওয়ালা নূতনদের তরবিয়ত করে দেবেন ও পুরাতনদিগকে উন্নতির চরম মর্যদায় পৌঁছে দেবেন। যেমন ওয়ায়েল ইবনে হাজর ও হজরত মোয়াবিয়ার (রাঃ) ঘটনা।

ইহা হচ্ছে দাওয়াতের মেজাজ যে, নূতনদেরও বরদাস্ত করো এবং পুরাতনদেরও বরদাস্ত করো। নরামিয়াতের সঙ্গে কাজ শেখাও। এবং সাথীদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে চলো।

সংকীর্ণ মনের দ্বারা এ কাজ হবে না। বরং দিলের প্রশস্ততার দ্বারা এ কাজ হবে। এর দ্বারা হজতেমায়েত অর্থাৎ আপোষের জোড় বাকি থাকবে। আমরা তো সামান্য কথার দ্বারা সাথীকে ছেড়ে দিই। হাবসার বাদশা নজাশী বললো জোর আমার কারোর উপরেই নেই। আমার প্রজাদের মধ্যে যে মুসলমান হয়ে যাবে তাকে আমি কিছুই বলব না। আর যারা খ্রীষ্টান থাকতে চায় তাদেরকে তোমরা অর্থাৎ সাহাবারা কিছু বলবে না। সাহাবারা সব দেখতে যদি একটা মানুষ খ্রীষ্টান থাকতে চাইতো তো সাহাবাদের বড় দুঃখ হতো।

২০০২ সালের ভারতবর্ষের জোড়ে হজরত মাওলানা ইব্রাহিম সাহেব (মজদ্দা জিললুহুল আলি) – এর পুরাতন কর্মীদের মাঝে নসিহত

এই কাজের একটা বড় আসর হচ্ছে এই যে, সমস্ত মুসলমান এই কাজ করলে আপোষে ভাই বেনে যাবে। মদীনা ওয়ালারা হুজুর (সাঃ) এর কারনে ইসলাম কবুল করাতে উহাদের সমস্ত খেচাঁ তানি, পেরেশানি ও ঝগড়া বিবাদ সমস্ত খতম হয়ে গেল। নবুয়ত তো আপোষে ভায়চারি পয়দা করে। রাজত্ব করার জন্য পাটি বানানো জরুরী। এই মোবারক কাজ করার জন্য আপোষ ভাই বানা জরুরী। বান্দা বাননা ও বানানা জরুরী। (হাদিস) প্রথমে আল্লার বান্দা বানো, ফের আপোষে ভাই বানো। সমস্ত বান্দারা আল্লার বান্দা বানুক ইহাই হুজুর (সাঃ) এর দুনিয়াতে আসার মকসাদ। বান্দা বানা ছাড়া একাজ হবে না। নিজের ছাড়ো, খোদার লাও, এটাই হচ্ছে বান্দা বানা। হুজুর (সাঃ) এই কাজ বান্দা বেনেই করেছিলন।

(হাদিস)

যদি কেহ নিজকে বড় বানাই তো আল্লাহ তাকে ছোট করে দেন। হুজুর (সাঃ) এর শান আল্লার বন্দেগী ছিল। এই গুনে হচ্ছে আল্লাহ থেকে নেবার জন্য।

যদি এই কাজের দ্বারা নিজের নফস মোটা হয় যে, কেহই তার নজরে নেই। একমাত্র সে নিজেকে ছাড়া - তাহলে এটা শয়তানের কাজ। আল্লাহু তাবারাক-ওতায়ালা আদম (আঃ) কে বেছে নিলেন এবং পছন্দ করলেন। এতে শয়তান বিগড়ে গেল। কারণ উহার নজরে সে, ছাড়া কেউ ছিল না। নিজের বড়াই এর উপর চলা ও চালানো ইহা মরদুদের লাইন। ইহার সবচেয়ে বেশি ক্ষতির জিনিস। হুজুর (সাঃ) নিজে বান্দা বেনে মানুষ দিগকে বান্দা বানার ত্বারিকা শিখিয়ে ছিলেন। বান্দা বানা অর্থাৎ সবসময় আল্লার ফরমাবরদারি করা এবং আপোষে ভাই বেনে যাওয়া। আনসাররা আপোষে লড়াই করতে - হুজুরের নিকট এসেছিল। কিন্তু উহাদের ব্যাপারটাই পাল্টে গেল। আনসাররা হুজুর (সাঃ) এর হাতে হাত দিয়ে কথা দিয়ে ছিল ও প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আপনারই শুনব ও আপনারই মানব। আল্লাহতায়ালা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের খারাবিগুলো দেখিয়েছেন এবং আমাদেরকে এই জন্য বলেছেন যাতে আমরা উহা হতে বেঁচে চলি। ইহুদীরা

শুনে নিত কিন্তু মানত না। আনসাররা পাঁচটা, অবস্থাকেই বরদাস্ত করে নিয়েছিল। আপনারই শুনব, আপনারই মানব, ভালো অবস্থাতে মানবো, খারাপ অবস্থাতেও মানব। আমাদের মন চাইলেও মানব আর না চাইলেও মানব। আমাদের জিজ্ঞাসা করা হোক বা না হোক। এমন কি আমাদের জায়গাতে আমাদেরকে সরিয়ে অপরকে আনলেও তাকে ও মানব। কতবড় ইখলাস তাদের ছিল। এবং এই মানাটা সাফ দিলের সঙ্গে হবে। এই নয় যে যদি বলি তো লড়াই হয়ে যাবে। তাই চুপ হয়ে আছে। সাহাবাদরে দিল পবিত্র ছিল। আল্লাহ পবিত্র, তাই পবিত্র দিলকেই পছন্দ করেন। এই জন্য আমরা যদি - আমার সহিত খারাপ ব্যবহার করে তো আমরা তাকে মাফ করে দিয়ে শুয়ে যাব। (হাদিস) হজরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কে হুজুর (সাঃ) বলেছিলেন, বেটা এই রকম থাকো যেন তোমার দিলে কারো প্রতি কোন ময়লা না থাকে। ইহাই আমার সুন্নত।

যখন ওজু ও গোসল শরীরকে পাক করার জন্য এত প্রয়োজন তবে দিলের পাকি কি বেশি প্রয়োজন, তবে দিলের পাকি কি বেশি প্রয়োজন হবে না? সাহাবাদের কওল, আমরা হুজুর (সাঃ) এর হাতে হাত দিয়ে কথা দিয়েছি ও প্রতিজ্ঞা করেছি যে, প্রতিটি মুসলমানের ভালায় চাইব। অপরের ভালোয় চাওয়া - এটাই হচ্ছে দ্বীন। আমার থেকে অপরের কাছে ভালোয়ি পৌঁছে এবং আমার দিলের মধ্যে সবার জন্য ভালোয় আছে এই জিনিসটা এই মোবারক কাজের দ্বারা নিজের মধ্যে আনতে হবে। যদি না থাকে, আমাতে হবে। এটাই হচ্ছে কাজ করার ত্বারকা।

হিংসা কারী অপরের উন্নতি কখনই পছন্দ করে না। হিংসুক তাকেই বলে যে আপরের খারবি চায়। আর নসিহত কারী ও খয়েরখা তাকে বলে যে সকলের ভালো চায়। ইসলাম এটাই চায়। যদি আমি অপরের খারাবি চাই তো আমার উপরও খারাবি আসবে।

হজরতজী (রহঃ) ফরমায়েছেন, যত কথা উম্মতের সঙ্গে করার আছে ও করতে হবে ঐগুলো সমস্ত হায়াতুস্ মাহাবার মধ্যে আছে। ইহা কিতাব নয় বরং সহীহ পথ দেখানোর দসতাবেজ অর্থাৎ নিয়মকানুন। উম্মতের রাহাবারী এই রাস্তাতেই পাওয়া যাবে। সাহাবাদের তবকা সর্বপ্রথম ও সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ তবকা। তাদের মধ্যে এই জিনিসটা ছিল না, যে আমাদের শুনবে আমরা তার শুনব। যদি আমাদের না শোনে তো আমরা তার কেন শুনব? নিজের কথা না মানার উপরেতেও নিজের কথা কেটে যাওয়ার উপরেতেও কোন রাগ ছিল না।

বরং আল্লাহ ও রাসূলের কথা কাটার উপরে রাগ হতো । পথ দেখাতো তো সেই চাইবে যার মধ্যে এতায়াত আছে। যদি এতায়াত না থাকে তোফের তার নিজের মর্জি ও খেয়ালটাই তার রাহবার বেনে যায়। নবীওয়ালা কাজের দ্বারা প্রতিটি জিনিস জিন্দা হবে। করনেওয়ালাদের রাহাবারি করার জন্য ঐ সমস্ত ত্বারকা দেখতে হবে যাহা হাঁয়াতুস সাহাবার মধ্যে আছে।

তোমাদের মধ্যে যে সহীহ রাস্তার উপরে চলতে চাইবে তারা তাহাদের রাস্তা নিক যারা চলে গেছে অর্থাৎ আসাহাবে মুহাম্মাদ (সঃ)। এই কাজকে সঠিক ভাবে করলে মেজাজের মধ্যে পরিবর্তন আসবে। যেমন সার্কাসের বাঘের মেজাজ আর জঙ্গলের বাঘের মেজাজ এক হয় না। ঘোড়ার মেজাজও পাল্টে যায়। যখন জানোয়ারের মেজাজ পরিবর্তন হয়ে যায় যার কারনে তারা আশরাফুল মাখলাকাত মানুষের মজোজ পাল্টে যাবে তখন সেও আসল স্রষ্টা আল্লার অধীনে হয়ে যাবে এর মধ্যে জোড় আছে। কুফরওয়ালা ও নাফারমানিওয়ালা উভয়েই কিয়ামতে আজাবে ভুগতে থাকবে। তারা কিয়ামাতে আকাঙ্খা করবে আমাদিগকে জমিনের মধ্যে লেপটিয়ে খতম কেন করে দিলে না।

ইসলামের মানে জামিনের উপর গর্দান রেখে দেওয়া আল্লার ফরমাবারদারিতে। আমরা নিজেকে নিজে যেন ধোঁকার মধ্যে না রাখি। আমাদের ভেতরে ঐ জিনিস পয়দা হোক যা হওয়ার দরকার। দিল সাফ থাকবে দুনিয়ার গরজ থেকে। দিল সাফ থাকবে মানুষের সঙ্গে মিল মিলাপের মধ্যে। কাহা কেও হাকির বোমা ছোড়া হারাম। মুসলমানের উপরে বদগুমানি হারাম। কঠিন ভাবে মানা করা হয়েছে। দাওয়াত তো খুব ভাল মানা করা হয়েছে। দাওয়াত তো খুব ভাল জিনিসের নাম ।

তাহলে তার মধ্যে লড়াই কেমন করে হবে। দ্বারা কাজ চলবে। আমাদের দ্বীনের মধ্যে তো সবটাই অর্থাৎ সবটাই ভাল। নিয়েত ভাল হওয়া জরুরী। ত্বরিকা ভাল হওয়া জরুরী। এটাও যেন সুন্দর হয়। বেঢংগাপনা যেন না হয়। কথা করবে তো আদবের সঙ্গে করবে। বেঢংগা কাজ ফাটা মটকার মত। ওটাকে কে নেবে। ফিকে ফেলে দেওয়া হবে। মাশওয়ারার মধ্যে বেঢংগাপনা যেন না হয়। তাহলে দিল জুড়বে না। যোগ্যতা কাজের মধ্যে লাগবে না। বেঢংগীর নামাজ মুখে মেরে দেওয়া হবে। আমাদের কাজের মধ্যে বেঢংগাপনা নেই। ইসলামি জীবনে আদর আখলাক প্রথমেই শেখানো হয়। এমনকি ছোট ছোট ছেলেদের কেও। অথচ তাদের উপর এখন কোন ফরজের জিম্মাদারী নেই। ভালো চাওয়া, ভাল সুমানের

মধ্যে আপোষে একে অপরের ভালোটাই দেখা যাবে। দোষের উপরে পর্দা পুষি করা হবে। এটাই হচ্ছে ইসলামি জীবনের চাহিদা। মানুষের দোষের উপরে যদি পরদাপুষি না করা হয় তো মানুষের গুরুত্ব শ্রেষ্টত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। ইহা তো বাতিলের সমাজ জীবনে যে, দোষগুলিকে খুব ছড়াও, আর মানুষের ভাল গুনটাকে গোপন করে দাও। মানুষের মধ্যে যখন অহংকার পয়দা হয় তখনই সে অপরের দোষ প্রকাশ করে দেয়। এক ব্যক্তি এল এবং বলল, আমার একটা ছেলে আছে তার বিয়ের পয়গাম আসছে। কিন্তু তার দ্বারা একটা গুনাহ হয়ে গেছে, এখন কি করব? বলা হল গোপনীয় জিনিসকে প্রকাশ করা মোটেও জায়েজ নয়। যেমন একটা ভালো লোকের বিবাহ দেওয়া হয়, ঐ রকম ভাবেই করতে হবে।

আমাদের মাশেরাতে অর্থাৎ সমাজ জীবনে দোষ গুলিকে প্রকাশ করে দেওয়া ভালো জিনিস নয়। যদি আমাদের মধ্যে লোকের দোষ ত্রুটিকে প্রকাশ করা এবং ছড়ান অভ্যাস বেনে যায় তাহলে তাবলিগ কোথায় রইল। যদি কথা বলতে বলতে গলদ কথা মাঝে এসে যায় তো তার অলোচনাই ছেড়ে দাও। যদি গলদ কাজে সময় লাগতে থাকে তাহলে আসল কাজের মধ্যে সময় কোথায় লাগছে। আমাদের মেজাজ গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে বলেই ভালোদের উপরে ঘৃণা আসে। বুলবুল পাখি ফুলের উপরে বসে এবং বাগানে থাকে। আর কাক দুর্গন্ধ মেখে থাকে এই জন্য সে বুলবুলির সঙ্গে লড়াই করে। এমার বিন হাশিম অর্শের অসুখে কঠিন আক্রান্ত হয়েছিল তখন ফেরেস্তারা তার খোঁজ খরব নিতে আসত।

আমাদের একটা সবক ভিতরকে পাক রাখা তার জন্য পুরোপুরি মেহনত করা দরকার। ভেতরের পবিত্রতা আসুক, মানুষের ভালো চাওয়ার মেজাজ বেনে যাক। যে ব্যবহার লোকের সঙ্গে করব ঐ ব্যবহার আমার সঙ্গেও হবে। যদি আখলাক ব্যবহার ভালো না হয় তো ইবাদতকে খেয়ে নেবে। যদি ভিতরটা ভালো সহীহ বেনে যায় তাহলে প্রত্যেকটা আমল ইবাদত বেনে যাবে। এ কাজের চাহিদা হচ্ছে উহার কদর করা হোক। আর উহার কদর এটাই যে, এই কাজ হখলাস ও করবানীর সঙ্গে করতে হবে। প্রতিটি অবস্থায় এই কাজ হতে হবে। যদি এই কাজের কদর হয় তাহলে সমস্ত পেরেশানি দূর হয়ে যাবে।

মানুষ আল্লার দেওয়া রুজি খায় আর তাকে বড় মানে না, তার হুকুম ও মানে না। তাহলে ফের সকলে আমাকে কেমন ভাবে বড় মেনে নেবে। আর আমার কথা কেমন করে মানবে। কাজের গুরুত্ব এই জন্যই পাওয়া যাচ্ছে না যে, আমাদের জেহেন অন্য কাজের। জিনিসের মধ্যে ফেঁসে আছে। কাজের কদর

করি নচেৎ এই কাজ হাত থেকে বেরিয়ে যাবে সাহাবারা সব সময় এই ভয়ই করতেন কি জানি এমন যেন না হয় যে, আমাকে হাটিয়ে দিয়ে অপরকে কাজের মধ্যে নিয়ে আসবে। কুরায়েশরা হুজুর (সাঃ) এর কদর করল না তো আল্লাহতারালা মদিনাওয়ালাদিগকে এই কাজের মধ্যে নিয়ে এলেন। আর কুরায়েশদিগকে পিছনে ফেলে দিলেন।

এই মোবারক কাজ মহব্বতের সঙ্গে করতে হবে। যে হিজরত করে তার সহিত মহব্বত করতে হবে না। সাহাবাদিগকে আল্লাহ তাবারাকঅতাওয়ালা হুজুর (সাঃ) এর সাথী করার জন্য বেছে আনলেন। হুজুর (সাঃ) এর সামান্য কষ্টও তাদের সহ্য হত না। আনসারদিগকে বললেন, তোমারাও খুব বুঝে বুঝে থাকবে। মানুষ তোমাদের কদর করবে না। তোমরা সবর করে নেবে, আমি হাওজে-কাওসারে তার বদলা পাইয়ে দেব।

এই কাজের খুব কদর করতে হবে। যেন হাত থেকে চলে না যায়। এই জন্য পাবন্দীও খুব জরুরী।

পাঁচটা কাজ ঐ রকম যেমন ঘরকে পরিস্কার করা।

বোকামি কাম যখন হবে, তখন ভিতর ঠিক হবে শুধু ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললেই রোগীর আরোগ্য মেলে না। ব্যবসার কথা টেপকরে নিলে মাল পাওয়া যায় না। মেহনত হলে তবে হেদায়েত আসবে। মেহনত নেই তো হেদায়েত কেমন করে আসবে। এই কাজ আমাদের জীবনকে ঠিক করবে, জীবন পাল্টাবে। তবলিগের দ্বারা ফায়দা হওয়া দরকার। আমাদের জান, মাল আল্লার হুকুমের উপর ও মানুষের ভালোয়ের মধ্যে লাগতে হবে।

হজরত জী (রহঃ) ফরমাইয়াছেন - প্রত্যেক সাহাবী দুনিয়া থেকে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে। যদি আল্লার ভয় দিলে না পয়দা হয়, তো বাহাদুর বেনে যাবে। তখন আপোষে লড়াই করবে। যদি ভিতরে ফিকির পয়দা না হয় তো গাফলত এসে যাবে। আপোষে একে অপরের কদর করনেওয়ালা বনি। সাথীদের এবং সমস্ত কাম করনেওয়ালাদের এবং দ্বীনের প্রতিটি শাখা প্রশাখার কদর করনেওয়ালা বানতে হবে। হুজুর (সাঃ) নিজের সাহাবাদের ফাজায়েল বলে বলে তাদের কদর বাড়াতেন। নিজের উম্মতেরও কাজায়েল ও শুনিয়েছেন। নিজের উম্মতের ও ফাজায়েল শুনিয়েছেন। তো ফের আমাদের জন্য কি সবক হলো হক একে অপরের সাহায্যের দ্বারা ছড়ায়। আর বাতিল হিংসার দ্বারা ছড়ায়।

২০০২ সালের ভারতের জোড় আখেরি মজলিশে হজরত মাও সাদ সাহেবের বক্তব্য ঃ

আল্লার সাহায্য নামবার একটাই বুনিয়াদী জরিয়া সেটা হচ্ছে এজ তেমায়েত অর্থাৎ আপোষে জোড়। এজতেমায়েত উসূলের উপরে হবে। বেউশুলির উপর হবে না। উহার জন্য প্রথম শর্ত দিল সাফ হওয়া। সেকায়েত হলে দূরত্ব পয়দা করবে। (হাদিস) আমার কাছে কেউ যেন কারোর শেকায়েত নিয়ে না আসে। আমি চাইছি আমি যখন তোমাদের কাছে থেকে বিদায় হবো। তখন যেন আমার সিনা তোমাদের সবারই উপর থেকে সাফ থাকে।

সাথীদের কুরবানি যখন দেখব, তখন তাদেরকে কাজে পাওয়া যাবে। আর যখন সাথীদের কমজোরি পাওয়া যাবে। আর যখন সাথীদের কমজোরি অথবা দোষ দেখব তো সে নষ্ট হয়ে যাবে। সাথীদেরকে নির্ভরযোগ্য বানাও। সাথীদিগকে জখমী করো না। সাথীদেরকে বেউশুলিকে অর্থাৎ দোষকে এত গোপন করো যেন তাদের ভারিত্ব গুরুত্ব বাড়ে। যত ভারিত্ব বাড়বে ততই কাজ হবে। হজরত আসলাম (রাঃ) হজরত ওমরের দরজায় পাহারা দিচ্ছিল। হজরত জোবায়ের ভিতরে প্রবেশ করতে চাইল। তো রুখে দেওয়া হল। কেন না এজাজত নেই। হজরত জোবায়েরের গোসসা হয়ে গেল। সে আসলাম কে থাপ্পড় মেরে দিল। এখবর হজরত ওমর (রাঃ) এর নিকট পৌঁছালো। হজরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন তুমি ওকে থাপ্পড় কেন মারলে। আমি, ওকে তো মানুষকে রোখবার জন্য আমি নিজে লাগিয়েছি। জোবায়ের তোমাকে তো সে এর আগে কখনও সে রোখে নি। জোবায়ের যদি তুমি সাথীদেরকে জখমী করো তো সাথীরা লোকসান হয়ে যাবে। জঙ্গলে যে আলাস থাকে জানোয়াররা সকলে মিলে তাকে খেয়ে ফেলে। আর সে খতম হয়ে যায়। একটা সাথী কাজ থেকে কেটে যাওয়া পুরো একটা মজমা কেটে যাওয়া। আমরা সাথীদের বেউশুলিকে মাফ করে দিই। কেননা তার কোরবানি তার বেউশুলি থেকে অনেক বেশি। ভুল ভ্রান্তি দোষ ত্রুটি তো মানুষ হবার কারণে হয়। কোরবানি কাজের জন্য হয়। বেউশুলি তো বিভিন্ন অবস্থার কারনে হয়ে যায়। উহার উপর পাকড় করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। হ্যাঁ আম ভাবে এটা বলা যেতে পারে ভাই আমাদের এটা করা চলে না। একটা হচ্ছে বেউশুলির উপরে পাকড়, আর একটা হচ্ছে বেউশুলির উপরে মোতাওয়াজ্জা করা। যেমন ভাই এটা বেউশুলি হল। এটা

করা ঠিক নয়। আমরা যেন আগামীতে আর না করি। বেউশুলির উপর মোতাওয়াজ্জা করার এজাজত আছে। পাকড় ধাকড় করার এজাজত নেই।

বেউশুলি কারনেওয়ালার খুব নিকটে হয়ে যাও এবং তাকে ও খুব নিকটে নিই। মসজিদে নববীতে পেশাব করনেওয়ালা আরবীর উপরে প্রথমে হুজুর (সাঃ) সফকত করলেন। নরম ব্যবহার করলেন। তারপর তাকে ঐ অবস্থায় পেশাব পুরা করার এজাজত দিলেন। তারপর নিজ যাত্রীদের দ্বারা ক্ষতিটা পুরা করালেন অর্থাৎ পানি বইয়ে দেবার হুকুম দিলেন। এবং তাকে খুব মহব্বতের সঙ্গে বোঝালেন। তখন সেই আরবি হুজুর (সঃ) হইতে খুব মোত্তাসির হয়ে অর্থাৎ প্রভাবিত হয়ে ফিরে গেল। আর তার সংশোধন ও হয়ে গেলো। আমাদের তো ঐ পর্যন্ত শান্তিই আসে না, যতক্ষণ না সাথীর বেউশুলিকে নিজের নিকটের লোকের কাছে আলোচনা না করি। বাতেলকে খতম করো উহার আলোচনা বন্ধ করে। আর এই আলোচনা বন্ধ হবে এসতে খলাসের দ্বারা অর্থাৎ নিজেকে নিজে এতটা মশগুল করেদিই কাজের মধ্যে জেহেন থেকে ঐ জিনিসটা খতমই হয়ে যায়। আমাদের এখানে উশুলের আলোচনাও হবে বেউশুলের আলোচনা হবে। বেউশুলিকে গোপন করো। উহারদিকে শুধু দেয় এবং উহার জন্য দুক্ষ করো। আল্লাহ উহার থেকে যেন বেউশুলি অর্থাৎ খারা পাকাজ দূর করে দেয়। আর যদি একান্ত বলাটাই বাকি থেকে যায় তো ঐ রকম জিম্মাদারের কাছে বলো যে উহার সংশোধন করতে পারে এবং উহার খুব গোপনীয়তার সহিত। এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ কারোর জন্য বলার কোন রাস্তা নেই। যেমন উহার ঘরটা এরকম তার ঘরের লোকরা জন্য বলার কোন রাস্তা নেই। যেমন উহার ঘরটা এ রকম তার ঘরের লোকেরা এই রকম, তার কামাইটা এই রকম উহার কাজকাম এ রকম। এই সমস্ত বলার কারোর উপরে হক নেই।

অনেক সাথী অপরের উশুলের কারনে নিজ উশুলের উপরে কায়েম থাকে। আর মনে মনেভাবে ঐ সাথী যখন বেউশুলি করবে তখন বেউশুলি করার রাস্তা আমাদের জন্য বেরিয়ে যাবে। নাভাই, ইহা ঠিক নয়, ইহা তো প্রত্যেকেরই আপন চলার রাস্তা। এই রাস্তায় কেহ কাহারো কারনে চলে না।

মানুষেরা এসে সাথীর শেকায়েত জিম্মাদায়ের নিকট পৌছে দেয়। যাহার ফলে শিকায়েত করনেওয়ালা জিম্মাদারের খুব নিকটবর্তী হয়ে যায়। আর ঘর শেকায়েত করেছে সে জিম্মাদায়ের থেকে দূরে হয়ে যায়। অথচ উচিত ছিল শোকায়েত করনেওয়ালাকে দূরে ফেলা দেওয়া। আর উহার শেকায়েত করাই হিম্মত ভেঙ্গে দেওয়া। কারণ সে শেকায়েত এনে এনে আপোষের মধ্যে দুরত্ব না বাড়ায়।

যদি এই তিনটে কাজ না হয়, তা'হলে বড় কঠিন কথা, সাথী নষ্ট হয়ে যাবে। আমাদের তবিয়তের মধ্যে যেন জমিয়েত অর্থাৎ সকলকেই নিজের করে নিয়ে চলা। তবকা (শ্রেণী) ফেরকা (দল) তং নজরী (ছোট নজর) তং দিলে (সংকীর্ণতা) এই গুলি হবে না।

নিজের নিজের খেয়ালে মানুষকে এক জায়গায় জমা করে জামাত বানানো হবে না। কেননা কাজ পুরো উম্মতের কোন শ্রেণীওয়ালাদের নয়। আমি কোন তবকার মোকাব্বিল না হই। (কুরআন) যত বাতেল দল আছে উহাকে তোমরা খারাপ বলো না। নচেৎ উহারা মূর্খতার কারনে আল্লাহকে খারাপ বলতে শুরু করে দেবে। আমরা এই কাজ সাথী বেনে করব। মোকাব্বিল বনে নয়। আমরা তো দ্বীনের প্রতিটি শাখা প্রশাখার সাহায্যকারী ও সাথী হয়ে যাব। আমরা কারোর মোকাবিল হব না। নচেৎ আমরা নিজেরাই একটি জামাত বেনে যাব। এবং একলা হয়ে যাব। এই যে তাবলিগ জামাত নাম ইহাও অপরের দেওয়া আমাদিগকে তো উন্মত বেনে করতে হবে। হাদীসে আছে, উম্মত বলা হয় দ্বীন শেখানেওয়ালাকে। অর্থাৎ উম্মত বেনে কাজ করব, তাবলেগী বেনে নয়। এরকম একটা অনুভব হচ্ছে যেন আমরা বহু দ্বীনি কাজের (আমরা) মোকব্বিল হয়ে যাচ্ছি। আর ইহার কারন আমরা অপর দ্বীনী কাজ করনেওয়ালাদের সহিত মেলামেশা ও মোলাকাত কম করে দেবার কারনে।

এই মোবারক কাজের সব থেকে বড় হওয়ার কারন এটা নয় যে বাকী সব দ্বীনী কাজ এর থেকে ছোট বরং এই মোবারক কাজ সমস্ত দ্বীনী কাজের সাহায্যকারী। শিকায়েত এল আমার নিকট যে অমুক কামকারনেওয়ালা কুরআনের তফসীরের মজলিশে বসছে। আমি তাকে বললাম তোমার জেহেনের মধ্যে এটা কেমন করে এল যে সে কি কোন খারাপ কাজে শরীক হয়েছে। শেকায়েত আমার নিকট এল আমাদের কুরআনের তফসীর শুরু হয়েছে। আমি তাকে বললাম মনে হচ্ছে তোমার মতে মসজিদে এমন একটা কাজ শুরু হয়েছে যা মসজিদের মধ্যে হওয়া উচিত ছিল না। আশ্চর্য হই এরকম সংকীর্ণ দৃষ্টি হতে।

মনকে খুব বড় করে এই কাজ করে যেন প্রত্যেকেই এই কাজকে বড় গুরুত্বের সাথে দেখে। আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টি আমাদেরকে শুধু একটা তবকা বানিয়ে দিয়েছে। অথচ এখন একটা বড় তবকা কাজের মধ্যে লাগে নি। আমাদের মেজাজ সাধারণ মানুষের সঙ্গে এবং উলামায়ে কেরামদের সঙ্গে এমন হবে যেন প্রত্যেকেই আমাদেরকে আপন বোঝে। এই মোবারক কাজের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য জায়গা আছে এবং প্রত্যেকের জন্য জায়গা আছে এবং প্রত্যেকের জন্য রাস্তা আছে। হজরত আলি (রাঃ) করা যাচ্ছেন, এই রকম যেন না হয় ইলিমের আলাদা আলাদা হালকা চলছে আর একটা মানুষ এক হলকা থেকে উঠে অন্য হালকায় চলে গেলে লড়াই শুরু হয়ে যাবে।

এ কাজ শ্রেণীগত নয় যে ভাষার ও গোষ্ঠীর কাজ বেনে থেকে যাবে। জামাত সবকরম লোক লইয়া মিলিত বানাতে হবে। যেমন সবরকম লোক লইয়া মিলিত বানাতে হবে। যেমন - মেহয়াত ওয়ালারা আলাদা চলছে, ইউপিওয়ালারা আলাদা চলছে, গুজরাতওয়ালা আলাদা চলছে এই জন্য যে উহাদের। মধ্যে একে অপরের তবিয়তেয় সঙ্গে মিলে খায় না। অথচ পুরো উম্মতের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে মিল খাওয়ানোর জন্যই তো

এই মোহনও। (হাদিশ) তোমরা জামাতে বের হও নিজের কওম ছাড়া অন্যের সঙ্গে। ইহার দ্বারা তোমাদের মধ্যে উচ্চ আখলাক পয়দা হবে। এবং তোমরা কওমের মধ্যে ইজ্জতওয়ালা হয়ে যাবে।

একরামে মুসলিমের মোজহাদার দ্বারাই উচ্চ আখলাক পয়দা হবে। একরামে মুসলিমের হকিকত পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে। এবং একরামে মুসলিমের মেজাজকে চিনে সেই মত তার সহিত ব্যবহার করতে হবে। খাস করে যার সহিত খোনাসিবাত (আলাপ পরিচয়) নেই উহার সহিত মোনাসিবাদ পয়দা করা অর্থাৎ মিলমিলাপ পয়দা করা। যার সহিত তবিয়ত মেলে না, তার সহিত তবিয়ত মেলানো।

একাজ শুধু খাস লোকাদিগকে ডাক্তারদেরকে, ইঞ্জিনিয়ারদেরকে, উচ্চ শিক্ষিতদেরকে নিয়ে যেন না হয়। শ্রেণীতে কাজ তো শ্রেণীওয়ালাদিগকে এই কাজের দিকে মোতাওয়াজ্জা অর্থাৎ ঘোরনোর জন্য। লাগাতার চালানোর জন্য নয় যে উহার তালিম ও উহাদের মাশোয়ারা ও উহাদের বায়ান ও উহাদের জোড় আলাদা ভাবেই হতে না করে কখনও।

কোন সময়ে উহাদিককে জুড়ে নেওয়া উহাদিগকে একাজের দিকে ঘোরানোর জন্য। এবং ইহা ও প্রথমের দিকে ছিল। এখন উহাকে শেষ করে দোওয়া পুরানোরা নতুনদের বরদাস্ত করুক। পুরানা দিগকে নতুনদের সঙ্গে লাগানো। সব রকম নিয়ে মিলিত জামাত বানানো। তবকাতি মেজাজ যেন বেনে না যায়।

আপোষের এজতেমায়ের সব থেকে বড় জারিয়া সাথীদের কমজোরী গুলোকে অর্থাৎ দোষ ত্রুটিকে গোপন করা। মেয়ে এমন কোন কাজ খারাপ করেছে যে অন্য মানুষরা এর খবর পেয়ে যায় তো তার বিয়ের সম্বন্ধ আসা বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে এবার কখনই মেয়ের ঐ দোষকে প্রকাশ করতে চাইব না। যত সাথীদের কমজোরিকে অর্থাৎ দোষ ত্রুটিকে গোপন করা যাবে ততই উহাদের উপর এতেমাদ বাড়বে অর্থাৎ নির্ভরতা বাড়বে। যতটা এতেমাদ বাড়বে ততই সাথী কাজের মধ্যে ব্যবহার হবে। যদি একান্তই কারোর শেকায়েত করতেই হয় তো প্রথমে চিন্তা করে নিই যে, দিলের মধ্যে উহার ভালো চাওয়ার ও সংশোধনের জজবা আছে কি? না নিজের নফসের গলামির কারনে অর্থাৎ উহার প্রতি দিলের মধ্যে রাগ গোসসা থাকার কারনে এই শেকায়েত উঠেছে। মোসলেহ অর্থাৎ সংশোধন করনেওয়ালা দোআ করে, শেকায়েত করে না। দোষ ধরনে ওয়ালা ও হিংসা করনেওয়ালা শেকায়েত করে, দুআ করে না। দায়ী তো নিজেরই কমজোরী ভেবেই দুআ করে।

সাথীকে মোতামাদ অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য বানাও। আমাদের অবস্থা এই যে, যখন কেহ দোষ করে ফেলে তো সেই মুহূর্তেই উহার সংশোধন কেমন করে করা যাবে এই চিন্তা এসে যায়। উহার কুবরানীর উপর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেওয়া হয়। এবং উহার দোষ ত্রুটিকে এত বড় বানানো হয় যেন মনে হয় উহার সমস্ত গুণ খতম হয়ে গেছে। এই জন্য তখন

নিজের সমস্ত শক্তিকে উহার খেলাপ ব্যবহারকারী এবং আমাদের পরিবেশ কেও উহার দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও উহাকে মোতামাদ বানানো অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য বানানোর হুকুম আছে। এবং ইহাই হচ্ছে এই কাজের তাকাজা। নচেৎ সমস্তই নফসের তাকাজা হবে। হজরত জোবায়ের কে, হজরত আসলামের চাঁটা মেরে দেওয়ার উপরে হজরত ওমরের নসিহত, নিজের সাথীকে জোবায়ের জখমী করো না। যে জানোয়ার কে জখমী করে দেওয়া হয়, জঙ্গলের সমস্ত জানোয়ার তাকে খেয়ে নেয়। অর্থাৎ নিজের সাথীদের দুর্বলতা ও দোষ ত্রুটিকে সকল সাথীদের সামনে বা মজালিশের সামলে বায়ান করো না। নচেৎ সেই সাথী তার নীচে তার ছোটদের সামনে বড় হেয় প্রতিপন্ন হবে। এই জন্য সাথীদের কে মোতমাদ বানাও। সাথী বানে কুরবানি দ্বারা এবং নষ্ট হয় আমাদের বেউসূলির দ্বারা এই মেজাজ না বানাও যে যে আমাদেরকে মেনে চলবে না আমরা উহাকে সাথে রাখব না। বরং যে আমাদের মেনে চলবে না উহাকে আরো বেশি সঙ্গে রাখব পাবন্দি করব। যাহাতে উহার মধ্যে এতায়াত আসে। নিজের নিজের মতের লোকদিগকে নিয়ে চলা এটা রাজনীতি, দাওয়াত নয়। উসূলের মোজাকার করো। ধর পাকড় করো না। মোজাকারার মধ্যে সেও থাকার যে বেউশুলি করেছে। আর মোজাকরা এই ভাবে হবে। এ কথা বলা হবে, কি হয়ে গেল মানুষ যে এই রকম কাজ করছে। দোষ মানুষের গুনকে চাপা দিয়ে দেয়। একটা কালো দাগ সাদা কাপড়েরর উপরে পরিস্কার ফুটে উঠে। এই জন্য দোষ কে গোপন করতে হবে। মাফ করে দেওয়া, মাফি মাঙ্গার পরে এসব থেকে কমদরজার কথা। মাফি মাঙ্গার পরে মাফ না করা এ তো দীলের কেনা। সবথেকে বড় দরজা এইটা কাউকেও গোনাহ করতে দেখে তখন এই রকম হয়ে যাওয়া যেন উহাকে খবরই না হয়ে যে, ইহাকে অমুক দেখে নিয়েছে। আমাদের তো দোষ প্রকাশ না করা পর্যন্ত চয়েনই হয় না।

তরবিয়তে ইলম শরীরতের ইলমের চেয়েও কঠিন। হজরত ওমরের (রাঃ) মজলিসে একজনের নয় সবার পরে হজরত জারির (রাঃ) কথা। একজনের দোষকে গোপন করার জন্য সমস্ত মজলিসকে ওজু করানো হল। তরাবিয়ত যদি না হয় তো ইসলামের পরিচিত ও হবে না। পেশাব, পায়খানাতে যে দোআ পড়তে হয় ঐ দুআ বার বার ২ বার সবার পরেও পড়তে হয়।

একজন মুসলমানের বায়ু সরাকে গোপন করা এত বড় আহাম অর্থাৎ এত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস তো মুসলমানের হারাম কাজকে গোপন করা কত বড় জবরদস্ত যারা হবে। তরাবিয়তের ইলম সাহাবাদের জীবনী থেকে পাওয়া যাবে। সাথীদের জন্য রাত্রে কাঁদা, নিজের দোয়াব মধ্যে সাথীদের হক্ব বুঝাবে। তাদের সঙ্গে মাসওয়ারা করো। রায় নিলে, তার মধ্যে ফিকির পায়দা হবে। আর ইজতেমাযেত ও পয়দা হবে। আর যাব কাছ থেকে রায় নেবে সে নিজের যোগ্যতা কে তোমার সোপর্দ করে দেবে।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে পশ্চিমবঙ্গের জোড়ে
মাওলানা সা'দ সাহেবের ন সীহত,
পুরাতন কর্মীদের মাঝে
সকাল, নাস্তার পর, ১০টা হইতে ১২টা।

এই সমস্ত মজমা যাহারা এখানে জমেছে, ইহারাই হইল আমলা। আপনারদের পিছনে এলাকাতে বহু মজমা আছে। আপনারা সমস্ত প্রদেশের বাছাই করা আমলা। 'আমলা' উহাকে বলা হয় গাড়ি যার উপর চলে, যাহারা কাজকে নিয়ে চলে এবং যাহারা উপরে কাজের পুরো জিম্মাদারী দেওয়া হয়।

আল্লাহর যে ফায়সালা হয়, জিত কিংবা হারের, কামিয়াবি বা না কামিয়াবির, উহা সাধারণ মানুয়ের আমলকে দেখে আল্লাহ করেন না। বরং আপনাদের মত আমলাদের কর্মকে দেখে ফায়সালা হয়, যাহাদের উপর জিম্মাদারী ফেলা হয়েছে, যেমন অহুদের যুদ্ধের ঘটনা।

অহুদের যুদ্ধের সময় যে সমস্ত জিম্মাদার দিগকে পাহাড়ের উপর নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, উহারা যখন নিজের জিম্মাদারী হইতে হঠিল এই বুঝে যে, নীচেতে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। সাথীরা গণি মতের মাল জমা করছে, আমরাও উহার মধ্যে সামিল হয়ে যাই, এখন আমাদের উপরে পাহাড়ে থাকার দায়িত্ব খতম হয়ে গেছে। যখন এই জিনিসটা ঘটল, তখন যুদ্ধের ধারা পাল্টে গেল।

একটা বহুত বড় অসুখ আমাদের মধ্যে আছে। আমরা কাহাকেও বে-উশুলি করতে দেখলে, তখন উহা হইতে আমরা বে-উশুলি জায়েজ হওয়ার রাস্তা বের করে নিই। বে-উশুলি করনেওয়ালা কখনই নমুনা বানতে পারে না। নমুনা তো একমাত্র হুজুর (সঃ) এর জাত। হজরত জী মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলতেন, আমিও এ কাজের নমুনা নই। এ কাজের নমুনা তো হুজুর আকরম (সঃ)। আমি তো এ কাজের মোক্তাদি। হুজুর (সঃ) মোক্তাদা অর্থাৎ যাহাকে অনুসরণ করা হবে, উহাকেই বলা হয় নমুনা।

পুরোনো হওয়া ইহা কোন ইজ্জতের বিষয় নয়, ইহাতো বহুত বড় জিম্মাদারী আমাদের কাজ। সুতারং অহুদের যুদ্ধের মধ্যে যখন কিছু জিম্মাদার জিম্মাদারী থেকে সরে গেল, তখন যুদ্ধের কি অবস্থা দাঁড়াল ?

এমনকি যে সমস্ত ভালাই, মঙ্গল, বরকত ও খায়ের দুনিয়াতে আসে, উহা আমাদেরই কারনে। ঠিক ঐরকম যে সমস্ত খারাবি, ক্ষতি ও লোকসান দুনিয়াতে আসে, উহাও আমাদেরই

কারণে। ঠিক ঐ রকম যে সমস্ত খারবি, ক্ষতি ও লোকসান দুনিয়াতে আসে, উহাও আমাদেরই কারণে। হাদিসের সারমর্মঃ দুনিয়ায় যে সমস্ত খারাবিগুলি আল্লাহর তরফ থেকে আসে এবং যে সমস্ত বাধা বিপত্তি আসে, তোমরা যেন উহার জারিয়া বোনে না।

এ কাজ আমানত। এজন্য এ কাজকে আমানত দারীর সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। সর্ব প্রথমে এই মোবারক কাজের জন্য সাদা জেহেন, সাদা মেজাজওয়ালা হওয়া জরুরী। রাজনীতি চলে চালবাজির দ্বারা। আল্লাহতায়ালা জিম্মাদারীর বোঝা ডালেন, ফের দেখেন, কে এই জিম্মাদারীকে পুরো করল, আর কে করল না, তারপরে ছাটাই করেন। বহুত লোক কাজে লাগলো, আর কাজ ছেড়ে চলে গেল, কারণ ইহাই ছিল, উহারা নিজেদের কাবলিয়াতের (যোগ্যতার) বলে এবং একে অপরের সঙ্গে তাল্লুকাতের দ্বারা এই কাজকে নিয়ে চলছিল, আল্লাহার কাছে কবুল হওয়ার উপর চলে নাই। আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া তো কোরবানীর উপরে ও নিজেদের মধ্যে সিফত পয়দা হওয়ার উপরেতে হয়।

হজরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলতেন, আল্লাহতায়ালা যাহাকে চাইবেন তাহার ছাড়া কাজ নেবেন। এ কাজে আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হল, নিজের মধ্যে সিফত পয়দা করা। সিফত কি? উহা হচ্ছে মেজাজে নবুয়ত। নবীওয়ালা মেজাজ দ্বারা একাজ চলে না। যাহারা মেজাজে নবুয়তের উপরে পুরোপুরি এসে যাবেন, আল্লাহ উহাদিগকেই কাজের পুরোপুরি। ফমদ্দারী দিবেন, আল্লাহ উহাদিগকেই কাজের জন্য লইবেন। আর যাহারা মেজাজে নবুয়তের উপরে পুরোপুরি ভাবে আসবে না, উহাদিগকে আল্লাহ কাজ থেকে বার করে দেবেন।

যাহাকে আল্লাহ এই কাজের জন্য বাছাই করবেন, উহাদিগকে আল্লাহ খুব ভালভাবেই পরীক্ষা করবেন। উহাদের উপরে খুব খারাপ অবস্থা নিয়ে আসবেন এবং বাধা বিপত্তিত আনিবেন। এই জন্য আনবেন যাহাতে উহাদের ভিতরে সবর ও হেলেম (ধৈর্য্য) বেড়ে যায়। নবী (সঃ) এর উপরেও এই রকম বহু খারাপ অবস্থা আল্লাহ এনেছেন।

যেমন এক ইহুদীর ঘটনা ঃ একজন ইহুদীর নিকট হুজুর (সঃ) কিছু ঋণ নিয়েছিলেন। তখন ঐ ইহুদীর কিছুদিন পর, ঋণ শোধ হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই, হুজুর(সঃ) এর উপরে জোর তাকাদা ও কঠিন্যতা করা শুরু করে দিল। কারণ ইহুদী ইহার দ্বারা নবীর পরীক্ষা নিচ্ছিল যে, যদি উনি নবী হোন, তো হালিম কি-না অর্থাৎ ধৈর্য-শীল কি না?

আল্লাহতায়ালা সিফতের উপরে ও এখলাসের উপরে পরীক্ষা লইবেন। কেহ বেশী মাল লাগিয়ে ও টাকা লাগিয়ে ও সময় লাগিয়ে এ কাজের অংশীদার হতে পারবে না। আসল শর্ত হচ্ছে সিফত। ইব্রাহিম (আঃ) এর উপরে বহু পরীক্ষা আল্লাহ নিয়েছিলেন। তার পরে উনাকে মিল্লাতের ইমাম বানানো হইল, কারণ উনি সমস্ত পরীক্ষার মাঝে যে সমস্ত কষ্ট উঠিয়েছিলেন, উহাতে একমাত্র আল্লাহর রেজামন্দীর জন্য সমস্ত কিছু বরদাস্ত করেছিলেন। আল্লাহর কাছে আমাদেরকেও কবুল করাতে হবে, যেন আল্লাহ আমাদিগকে হেদায়েত দিয়ে

অপরের হেদায়েত জন্য জরিয়া বানান।

সিফত (ভালো গুন), এখলাস, এস্তেখলাস এই তিনটি জিনিস এই কাজের জন্য খুব জরুরী। চমকাইবে ঐ ব্যক্তি যাহার ভিতরে এ কাজের উপরে হক্কানিয়াতের এর এক্বীন পয়দা হবে অর্থাৎ এ কাজ যে হক্ক, ইহার উপরে এক্বীন হইবে, এবং পিছলিয়ে যাবে সেই ব্যক্তি, যে বিভিন্ন রকম কাজের মধ্যে জড়িয়ে ও খারাপ অবস্থার ঘেরার মধ্যে পড়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত এ কাজকে ছেড়ে চলে যাবে।

এক হচ্ছে এই মোবারক কাজ, আর এক হচ্ছে ঐ মোবারক কাজের বিভিন্ন দিকের ইন্তেজাম। অনেক কর্মী ইন্তেজামী কাজের মধ্যে শরিক না করার জন্য কাজ ছেড়ে দিয়েছে। যেমন মসজিদের ইন্তেজামী কমিটির মধ্যে শরিক না করার জন্য নামাজ ছেড়ে দিয়েছে।

সবচেয়ে প্রথম বুনিয়াদি কথা হল, কাজ করনেওয়ালা কর্মীদের ভিতরে এই মোবারক কাজের উপরে পুরোপুরি বসিরাত ও এক্বীন হতে হবে অর্থাৎ এই কাজে হচ্ছে হক্ক এবং এই কাজের দ্বারা আমার সমস্ত সমস্যার সমাধা হবেই, এর উপরে পুরোপুরি এক্বীন তৈরী হতে হবে।

দ্বিতীয় কথা হল, এই কাজ করনেওয়ালা সাথীদের মধ্যে এস্তেমায়েত পয়দা হতে হবে। অর্থাৎ আপোষে একে অপরের সহিত জোড়, মিল, মহব্বত পয়দা হতে হবে।

আল্লাহ-র সাহায্য আমাদের উপরে না আসার দুটো কারণ ১নং এই কাজের উপরে বসিরাত নেই অর্থাৎ এক্বীন নেই। দ্বিতীয় আমাদের মধ্যে এজতামিয়েত নেই অর্থাৎ আপোষে জোড়, মিল, মহব্বত নেই।

যদি নিজেদের ব্যক্তিগত আমলের মধ্যে কমজোরী থাকে কিন্তু নিজেদের মধ্যে মধ্যে কমজোরী না থাকে কিন্তু নিজেদের মধ্যে ইজাতামিয়েত মজবুত হয়তো কাজ চলে যা কেননা নিজেদের তাল্লুক আল্লাহ-র সাথে হওয়া, এটা আল্লাহ-র হক্ক, আর আপোষের মধ্যে ইজতামিয়েত, ইহা সাথীদের হক্ক।

হজরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলতেন, কর্মীদের নিজ নিজ ইবাদত ও রুহানিয়াত অর্থাৎ আত্মীক সম্বন্ধ, যদিও উহা আল্লাহ-র আরশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়, কিন্তু যদি নিজদের আপোষের মধ্যে, অন্তরের দিক হইতে দূরী পয়দা হয় অর্থাৎ আন্তরিক বিভেদ পয়দা হয় তো আল্লাহ-র সাহায্যে আমাদের উপর থেকে উঠে যাবে। 'জামাত' বলা হয় আল্লাহ-র জন্য জমা হওয়াকে। বহু সংখ্যক মানুষ জমা হয়ে যাওয়ার নাম 'জামাত' নয়।

এজতামিয়েতের মধ্যে কমী পয়দা হওয়া ও এজতামিয়ের ভেঙ্গে যাওয়ার কারণগুলিঃ-

একটা আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা হুজুর (সঃ) কে বহুত বড় সবর বলেছেন। উহা আমাদের জন্যও জরুরী। সাহাবার ইহার কারনে হুজুর (সঃ) এর সঙ্গে জুড়ে থাকতেন। যদি এই গুন হুজুর (সঃ) এর ভিতরে না হতো তো সবাই হুজুর(সঃ) কে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে

যেত। সেই সিফতগুলি এই ঃ-

(১) লি-নাত অর্থাৎ নরম হওয়া, নরম মেজাজে কথা বলা।

(২) সাথীকে মাফ করা।

(৩) আল্লাহর কাছে সাথীর জন্য মাফ চাওয়া।

(৪) সাথীকে নিয়ে মাশোয়ারা করা।

যদি এই চারটি গুন কর্মীদের মধ্যে পয়দা হয়ে যায় তো এই কাজের চেয়ে বড় মজবুত কাজ আর কিছুই নাই, আর এই মজমার চেয়ে মজবুত কোন মজমা নাই। যখন এই চারটি গুন আমাদের মধ্যে হাসিল হয়ে যাবে তখন আমাদের উন্নতির ও কামালিয়াতের এমন অবস্থা হবে যে, সমস্ত মানুষ তখন দেখতে থাকবে। হজরতজী (রহঃ) বলতেন, এই মোবারক কাজ হচ্ছে সমস্ত আলমকে নিজের বশে করার নকশা।

কাজ চলা আর নিজেদের মধ্যে আমলগুলি হওয়া এটাতো কাজের বাহ্যিক। দাওয়াতের দ্বারা দ্বীন পাওয়ার। এটা খুব মামুলি জিনিস, আর ইহা তো কাজ শুরু হওয়ার জমানা। আসল হচ্ছে আল্লাহ-র গায়েবী সাহায্য ও আল্লাহর বরকত নাজেল হওয়া। এ সমস্ত বড় বড় ভালই, এ কাজের সঙ্গে অতি অবশ্য হবেই। কিন্তু আপোষে ঝগড়া, আপোষে দ্বন্দ, আপোষে দিল ফাটা, ইহা আল্লাহ-র সাহায্যকে একদম রুখে দেবে। কর্মীদের সিফতের উপরে ও এ জতামিয়তের উপরে আল্লাহ-র গায়েবী সাহায্য আসার তাকিদ এসেছে ও আল্লাহর সাহায্যে নিবদ্ধ আছে ও বেষ্টিত আছে।

ঐ লোকেরা এই কাজের মেজাজ থেকে বহুদূরে আছে, যাহারা এই কাজের উসুলকে কঠিন্যতার সঙ্গে চালায় অর্থাৎ উসুলের উপর খুব কড়াকড়ি করে। কাজের উসুলতো হচ্ছে হেদায়েত; কোন আইন নয়, আইন তো দুষ্ট লোকের উপরে চলবে। আর আমাদের এই কাজ এতয়াতের উপরে চলবে অর্থাৎ মানার উপরে চলবে। ব্যাস যতটা বলা হয় ও যেরকম বলা হয় ঠিক ততটাই করা।

যেমন হজরত হোজায়ফা (রাঃ) কে কাফেরদের খবর নেওয়ার জন্য পাঠানোর হল, আর আবু সুফিয়ান নজরে পড়ে গেল। তখন হোজায়কা তীর কামান ঠিক করে নিশান লাগালো উহাকে মেরে দিলে কাফেররা কমজোর হয়ে যাবে, খুব ভাল সুযোগ এবং তিন মরতবা নিশান লাগালো কিন্তু ফের চিন্তা করল আমাকে তো হুজুর (সঃ) খবর নিয়ে আসতে বলেছেন, এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন কাজ করতে মানা করেছেন। নিজের মতের উপরে চলা, মানুষকে এতায়াত থেকে রুখে দেয় এবং জিজ্ঞাসা করে চলা থেকেও রুখে দেয়। যদি কেউ বে-উসুলি করে, তাকে আমরা নিজেরা নিমটাবো ইহা কখনও চলবে না। এ কাজ আল্লাহ-র আল্লাহ নিজেই নিমটাবেন। আমাদের এখানে না বে-উসুলির মোজাকেরা হবে, না বে-উসুলির উপর পাকড় ধকড় হবে।

আজকে আমাদের মধ্যে আমি জিম্মাদার, এই খেয়াল হয়ে যাওয়ার কারনে আমাদের

মধ্যে রাগ পয়দা হয়, অথচ উচিত ছিল নিজে খুবই ছোট হয়ে চলা। আমরা সর্বপ্রথম বে-উসুলি করনেওয়ালার সাথে নরম ব্যবহার করব। মসজিদে নববীতে একজন আরবীর পেশাব করনেওয়ালার সহিত হুজুর (সঃ) কত নরমীর সাথে কথা বলেছিলেন এবং মানুষ দিগকে উহাকে পেশাব করা থেকে মানা করার জন্য নিষেধ করেছিলেন। আজকে আমাদের রোগ হচ্ছে, বে-উসুলি আরও বাড়িয়ে দিই। সাথীদের দুর্বলতা ও সাথীদের দোষকে আলোচনা করা, ফাসাদকে সৃষ্টি করা। সাথীদের দোষ গুলিকে ও দুর্বলতাকে গোপন করা সাহাবাদের দোষ গুলিকেও দুর্বলতাকে গোপন করা সাহাবাদের মেজাজ ছিল। মসজিদে নববীতে পেশাব করনেওয়ালা আরাবীকে হুজুর(সঃ) যেন পেশাব করারই এজাজত দিয়ে দিলেন এবং সাহাবাদিগকে হুজুর (সঃ) পানি বহিয়ে দেবার জন্য হুকুম করলেন এবং আরাবীকে পেশাব করার জন্য নরমী সাথে মানা করলেন।

কাজ করনেওয়ালা কর্মীর মধ্যে নরমী থাকা দরকার। সাথীর উপরে কঠিন্যতা করলে সাথী যুদা হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কথা নিজের সাথীকে মাফ করা ও পাকড় না করা, উহাদের দোষ গুলিকে আলোচনা না করা। আরবিতে 'আফউন' মানে মিটিয়ে দেওয়া।

হজরত ওমর (রাঃ) বলতেন বাতিলকে খতম কর উহার আলোচনা বন্ধ করে। হক্ক দুনিয়ায় কায়েম হবে হক্কের আলোচনা করলে। আর বাতিল কায়েম হবে বাতিল আলোচনা করলে।

সাথীর দোষকে গোপন কর। হজরত ওমরের মজলিসে কাহারও বায়ু নির্গত হল। ইহার কারনে হজরত ওমর খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এবং হুকুম দিলেন, যার বায়ু নির্গত হয়েছে সে যেন এখনই ওজু করে আসে। আবদুল্লাহ বিন জরি (রাঃ) হজরত ওমরের নিকটই বসেছিলেন। তিনি তখনই হজরত ওমরের কানে কানে বললেন, ঐ ব্যক্তির একা উঠে যাওয়ার জন্য উহার বে-ইজ্জত হবে। সবচেয়ে ভাল হচ্ছে সকলকে ওজু করানো হোক। রজরত ওমর(রাঃ) একথা শুনে বড় খুশি হলেন এবং সমস্ত মজলিসওয়ালাকে অজু করার জন্য বললেন।

আর আজকে আমাদের তো এই অবস্থা। যদি কারও কোনও দোষের কথা আমরা পেয়ে যাই তো তখন আমাদের তবিয়তের মধ্যে চ্যায়নই আসে না, যতক্ষন পর্যন্ত না অপরের সামনে উহা আলোচনা না করি। সাথী দোষকে গোপন কর যাতে সাথী মো'তা মাদ বানে অর্থাৎ সকলের কাছে নির্ভরযোগ্য হয়। সাথীকে মাফ করে দিলে আপোষের মধ্যে এজতামিয়েত পয়দা হয়। আর আপোষের মধ্যে সাথীর দোষকে নিয়ে পাকড় ধাকড় করলে এজতামিয়েত খতম হয়ে যায়।

আমরা আপোষের মধ্যে এজতামিয়েত কি কি কারনে পয়দা হয় এগুলো আমরা শিখি। সাথীদের দোষ গুলিকে মাফ করে দেওয়া, ইহাতে সাথীরা মো'তা মাদ বানে অর্থাৎ সকলের কাছে নির্ভরযোগ্য হয়। অনেক সময় এরূপ ভাবে কারও বে-উসুলিকে লোকের

সামনে আলোচনা করলে ঐ সাথী সকলের কাছে হালকা হয়ে যায়। তখন ঐ সাথী আর নির্ভরযোগ্য থাকে না।

যেমন হজরত জোবায়ের (রাঃ) আসলাম (রাঃ) কে থাপ্পড় মারলেন, হজরত আসলাম রজরত ওমর (রাঃ) কে ঐ কথা বললেন। তখন হজরত ওমর (রাঃ) হজরত জোবায়েরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তুমি উহাকে মারলে? এবং হজরত ওমর আরও বললেন, দেখ যখন কোন পাখিকে জখমী করে দেওয়া হয়, তখন জঙ্গলের অন্য জানোয়ারেরা উহাকে খেয়ে ফেলে। কারণ তখন সে পাখি আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার কারণে সে আর নিজেকে হেফাজত করতে পারে না।

সাহাবারা সাথীদের কোরবানীকে তুলে ধরতেন, সাথীদের কমীকে নয়। সাথী কোরবানীর দ্বারা পরিচিত হয়, খারাবির কারনে নয়।

কর্মচারী যদি নির্ভরযোগ্য না হয়, দোকনদার উহার দ্বারা কাজ নিতে পারে না। সাথীর দোষকে বয়ান করা ও সাথীর দোষকে প্রকাশ করা, সাথীর ঐ দোষকে নিজের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। আমাদের এখানে সাথীর দোষ ও বে-উসুলির উপর পাকড়-ধাকড় নেই। কারণ আমরা কেহ হাকিম নই, আমরা সবাই রাখাল স্বরূপ। আমরা কাজের কর্মী, সকল সাথাকে নিয়ে চলবো। নবীদের দ্বারা এই জন্য ছাগল চরানো হয়েছে, মোষ চরানো হয় নাই, যে মোষের উপর ডান্ডা মারলে তার কোন আসর হয় না, কিন্তু ছাগলের হাড় বড় কমজোড়, খুব নরম।

নবীজীকে হুকুম দেওয়া হল নিজ সাহাবাদের সঙ্গে অর্থাৎ উম্মতের সঙ্গে মাশোয়ারা করা অথচ নবীকে সাহেবে ওহী ছিলেন। তাঁদের উপরে আল্লাহ-র তরফ থেকে ওহি আসত।

সব থেকে বড় উসুল মাশোয়ারা উহার দ্বারা সাথীরা গচ্ছিত থাকে। যাহারা রায় নেওয়া হবে। সে নিজের হয়ে যাবে। কোরানোর মধ্যে নামাজের সঙ্গে মাশোয়ারার জিকির হয়েছে। উম্মত ইবাদতের উপর জমা হবে নামাজের দ্বারা আর দাওয়াতের উপর জমা হবে মাশোয়ারার দ্বারা। আজকে মাশোয়ারার পা বন্দী করা বড় ঢিলা হয়ে গেছে, যার জন্য আপেযের এজতামিয়েতও কম জোর হয়ে গেছে। বড় হজরতজি (রহঃ) বলতেন যার থেকে রায় নেবে না উহার দ্বারা কাজ কি করে নেবে। যে জিম্মাদার সাথী রায় নেয় না, সে নিজেকে মনে করে অথরিটি (কর্ত্তা), আর সাথীরা আমার প্রজা অর্থাৎ আমার অধীনস্থ অথচ জিম্মাদার তো নিজেকে ছোট বানিয়ে রায় নেবে সাথীর সহিত। হজরতজি (রহঃ) বলতেন বাড়ির মধ্যে বিয়ে শাদি হলে তখন অনেক রকম কাজ ও অনেক রকম তাকাজা আসে, তখন সমস্ত খানদানের লোক মিলিত হয়ে ঐ সমস্ত তাকাজা পুরা করে। কোথাও হতে বিয়ের পয়গাম এলো, আর মেয়ের বাপ কাউকে জিজ্ঞেস না করে বিবাহের দিন ঠিক করে দিল, তখন ঐ বিবাহের দিনে সমস্ত খানদানের লোক নারাজ হয়ে যায়। মেয়ের বাপের এই ফয়সালা তাদের উপর বোঝা বেনে যায়। ঠিক তেমনি সাথীদের উপরেও ঐ কাজ

বোঝা বেনে যাবে অর্থাৎ সাথীদের উপরে ঐ ফয়সালা চাপিয়ে দেওয়া হল।

আমরা তো প্রত্যেক ঈমানওয়ালাকে মাশোয়ারার শরীক করব। হজরত (রহঃ) বলতেন, মাশোয়ারা তো সাথীদের দিলকে জোড়ার জন্য, সাথীদের মধ্যে কাজের ফিকির পয়দা করার জন্য। আমরা তো প্রত্যেক সাথীর রায়ের মুখাপেক্ষী। আল্লাহর সঙ্গে কার কিরকম তাল্লুক পয়দা হয়েছে এ সম্বন্ধে আমরা কেহ কিছুই জানি না। রায় তো আল্লাহর তরফ থেকে দিলের মধ্যে ফেলা হয়। অনেক সাথী নিজের রায়ের উপর জমে থাকে ও নিজের রায়কে নিজের হক বোঝে। কিন্তু রায় না দেনেওয়ালার হক, না লেনেওয়ালার হক, বরং রায় তো কাজের হক। যেমন নামাজের মধ্যে লোকমা, ইহা না ইমামের মধ্যে সেই লোকমা দেবে যার পুরোপুরি এক্কীন আছে যে নামাজের মধ্যে ভুল হয়েছে। ঐ ব্যক্তিই সহি লোকমা দিতে পারবে। ইহা হবে না যে সবাই লোকমা দেবে বা সবাই লোকমা দিলে কাজ হবে। এক দুজনের লোকমা দেওয়াই যথেষ্ট।

যে ব্যক্তি নিজের রায়কে নিজের হক বুঝবে, সেই ব্যক্তির শিকায়ত করবে যে, আমরা রায় তো চলে না। এজন্য সে মাশোয়ারায় আশা ছেড়ে দেবে।

মাওলানা সা'দ সাহেব, মাদ্দে জিললুহু বললেন, একজন এসে আমাকে বলল, আমার রায় তো চলে না, অতএব আমি সবরই করব। আমি বললাম আরে ইহা তো সবরের জিনিস নয়, ইহাতে তো শোকর করা দরকার।

রায় দেওয়া নিজের হক্ক নয়, ইহা এই মোবারক কাজের হক্ক। নিজের হক নষ্ট হলে উহার উপর সবর নেই। যদি আমার রায় না নেওয়া হয়েছে তখন আমি শুকরিয়া আদায় করব, কেন না খোদা না খাস্তা যদি আমার রায় নেওয়া হত এবং সেটাই ফয়সালা হয়ে যেত, আর যদি উহার মধ্যে কোন ক্ষতি থাকতো তো কাল আখেরাতে সমস্ত ক্ষতির দায়িত্ব আমরা উপর পড়ে যেত।

আমাদের মধ্যে এত্তেফাক (ঐক্য) না হওয়ার কারণ এটাই যে, আমরা ফয়সালা হয়ে যাবার পরেও নিজের রায়ের উপর জমে থাকি, আর ইহাকেই গ্রুপ বন্দী (দল বাজি) হয়, যে কাজ (অর্থাৎ মাশোয়ারা) উম্মতকে জড়ো করার ছিল, সেই কাজ আজ উম্মতের তোড়ের সবাব বানালো। রায় দেওয়ার জায়গা শুধু মাশোয়ারা। মাশোয়ারার বাইরে রায় দেওয়া খেয়ানত হবে ও ফেতনা হবে। ফেতনা এই জন্য যে, আমরা রায়ের সঙ্গে একমত হোনেওয়ালা আমার দিকে হয়ে যাবে আর আমার বাইরে রায় দেনেওয়ালারা তাহারা একদিকে হয়ে যাবে। আর খেয়ানত এই জন্য যে, রায় একটা আমানত, তার ক্ষেত্রস্থল মাশোয়ারা আর মাশোয়ারার বাইরে রায় নেওয়া হলে তখন আর আমানত রক্ষা হল না।

ইনফেরাদি ভাবে মাশোয়ারা করলেও এখতেলাফ পয়দা হয়। তখন সাথী নিজের নিজের বড় ও মুরুব্বীকে ছেঁটে নেয়। এটা দাওয়াতের মেজাজ নয়, এটা পার্লামেন্টরী মেজাজ। পার্লামেন্টারী মেজাজ হচ্ছে যে পার্লামেন্টে আমার একজন মেম্বার থাকবে,

সে-ই আমার সব কথা চালাবে ও আমার সব সমস্যার সমাধা করবে। এজন্য ইনফেরাদি ভাবে শুধু একজন জিম্মাদারকে নয়। সমস্ত জিম্মাদারগনকে জিজ্ঞাসা কর। এলাকা থেকে একজন মানুষ আসে এবং সে একজন জিম্মাদারকে জিজ্ঞাসা করে অর্থাৎ মাশোয়ারা করে, আর ঐ জিম্মাদার ঐ এলাকার ফয়সালা করনেওয়ালাদের মধ্যে; এজন্য তিনি সাথীর জিজ্ঞাসা করার পরেই একাকী ফয়সালা করে দেয়। তারপর ঐ সাথী যখন নিজেদের এলাকায় গিয়ে ঐ ফয়সালা মোতাবেক কাজ শুরু করে দেয় তখন অন্যান্য সাথীরা উহার সহিত এখতেলাফ শুরু করে দেয়। তখন ঐ সাথী বলে আমি তো অমুক জিম্মাদারকে জিজ্ঞাসা করে এসেছি এবং তার ফয়সালা লিখেও এনেছি, তোমরা কেন অমত করছ? এজন্য মাওলানা সা'দ সাহেব বলেন, সব মিলকে পুছো, সবসে পুছো।

মাশোয়ারা করার প্রথম শর্ত হচ্ছে মাশোয়ারাকে এজতেমারী বানাও। সাফ কথা আমাদের মাশোয়ারা এখনও এজতেমায়ী বানে নাই। মাওলানা সাদ সাহেব বলেন, নিয়ম হচ্ছে মসজিদওয়ার জামাতের সাথীদের মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দিলে তখন সকল সাথী মিলে নিজেদের অবস্থাকে জেলার মাশোয়ারাতে রাখুক। আর জেলার মাশোয়ারার সাথীরা তখন যদি প্রয়োজন বোঝে প্রদেশের মাশোয়ারায় রাখুক। আর প্রদেশের মাশোয়ারার সাথীকে যদি প্রয়োজন বোঝে নিজামুদ্দীন এসে জিজ্ঞাসা করুক।

নিজামুদ্দীনে আসাটা বরকতের জন্য নয় বরকত তো এতয়াতের মধ্যে আছে। অর্থাৎ মানার মধ্যে আছে। জিম্মাদারের জিম্মায় এই জিনিসটা থাকা দরকার, যদি কোন সাথী তাকে একাকী কোন জিনিস জিজ্ঞাসা করে, তখন সে বলুক, আমার বাকি সাথীরা কোথায় গেল? আর যদি ঐ ব্যক্তি এসে কোন কথা বলতেই চায় অর্থাৎ ফয়সালা করতেই চায়, তখন ঐ জিম্মাদার যেন আপন সাথীদের জিজ্ঞাসা না করে যেন কোন কিছু না বলে কারণ উহা একাকী ঐ ব্যক্তিকে বলে দিলে এখতেলাফ পয়দা হয়ে যাবে।

একজন ব্যক্তিকে শুধু জিজ্ঞেস করলে কি অবস্থা দাঁড়াবে, যেমন উহার উদাহরণ।

তবুকের সফরে সাহাবাদের খুব ভুখ লাগলো। তখন একজন সাহাবী আনসারী সে নিজের উটকে জবাই করে সাথীদেরকে খাওয়ার জন্য চিন্তা করল। এজন্য হুজুর (সঃ) কে জিজ্ঞেস করলো (ভাল কাজ করার জন্যও জিজ্ঞাসা করা দরকার। জিজ্ঞাসা না করে যেন ভাল কাজও না করা হয়)। আমাদের দাওয়াতের কাজ জজবার উপরে হয় না বরং তরতীবের উপরে হয়। জজবাকে তরতীবের উপরে আনতে হবে। বে-তরতীবে একাজ হবে না। যাহা হইক সেই সাহাবীকে হুজুর (সঃ) উট জবাই করে খাওয়াবার এজাজত দিয়ে দিলেন। তখন ঐ সাহাবী উটকে জবাই করার জন্য উটের উপর ছুরি রাখলো। হজরত ওমর (রাঃ) খবর পেয়ে বাধা দিল। তখন সেই আনসারী সাহাবা বলল, আমি তো হুজুর (সাঃ) এর কাছ থেকে এজাজত নিয়ে এসেছি। আজ সমস্যা হচ্ছে আমাদের কর্মীরা তবলিগকে শুধু একটা নিসাব পুরা করে দেওয়াটাই জেনেছে। এজন্য উহার আশে পাশেই চক্কর লাগাচ্ছে। দাওয়াতের

মেহনত দ্বারা নিজের এসলাহ ও তরবিয়াত হওয়াটা আজকে কেহ বুঝে না, কেন? এই জন্য যে 'হায়াতুস সাহাবা' কিতাব পড়ে না। অন্যান্য সমস্ত কিতাব পড়ে, যেগুলি সাহাবাদের জীবনী নয়, আর যে সাহাবাওয়ালা জীবনের কিতাব পড়বে না, আর সে নবীওয়ালা কাজ করবে, সে একদিন নিশ্চয় চোট খাবেই। এখনই ঐ উট সাহাবার নিজস্ব ছিল, শরিকানী উট নয়, তা সত্ত্বেও হজরত ওমর (রাঃ) উহাকে লইয়া হুজুর (সঃ) এর নিকট পৌঁছিলেন এবং বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ, আপনি এ কি করলেন? সফরে যদি উট জবাই হয়ে যায়, আমরা বাড়ি ফিরবো কি করে? হুজুর (সঃ) হজরত ওমরের কথা শুনে নিজের ফয়সালা ওয়াপ্স নিয়ে নিলেন এবং নিজের কথা পালটে দিলেন, অথচ নবীর ফয়সালার পরে আর কোন কথা বলার রাস্তা থাকে না। কিন্তু আজ আমাদের ফয়সাল নিজের ফয়সালার উপরেতেই জমে থাকে। সাথীদের রায়ের খেয়াল করে না।

হ্যাঁ, দুটো বরকত খুব বড়। ইহা মাশোয়ারার দ্বারা পাওয়া গিয়েছিল।

১। খন্দকের যুদ্ধে মদীনার চতুর্দিকে যে খন্দক খনন হচ্ছিল ঐ সময় পাথরের একটা বড় চাটান সামনে এসে গেল। সেই চাটান বিসমার হয়ে গেল অর্থাৎ টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

২। ঐ পাথরের চাটানের উপরে চোট মারার কারনে যে রোশনি বের হল উহার দ্বারা কায়সার ও কিসরা অর্থাৎ রোম ও পারস্যে বিজয়ের ঘোষনা, খোস-খবরী হুজুর (সঃ) দিলেন আর এই দুটো বরকতের পিছনে জড়িয়ে ছিল মাশেয়ারা। কারণ ঐ পাথরের বড় চাটান সামনে এসে যাওয়ার ফরেতে সাহাবারা সকলে জনা হল এবং হুজুর (সঃ) কে খবর দিয়ে আনলেন। এবং ঐ সম্বন্ধে হুজুরের মত জিজ্ঞেস করলেন। হুজুর (সঃ) নিজেই পাথরের চাটানের উপর চোট মারলেন। সাহাবারা হুজুর (সঃ) এর মাশোয়ারা না দিয়ে কিছুই করলেন না।

কোন জিম্মাদারকে উহার জিম্মাদারী এই এজাজত দেয় না যে সাথীদের রায় না নিয়ে একাকী ফয়সালা করে দেবে। আর ফয়সালা হবার পরে কেহ যদি নিজের রায়ের উপরই জমে থাকে তো ইহা হচ্ছে নাফসানিয়াত। কেহ জিজ্ঞাসা করলেন আপনি ইহা কি করে বুঝলেন? উত্তর দিলেন ফয়সালার আগে তো এতায়াত হয় অর্থাৎ যা ফয়সালা হবে মেনে নেব। কিন্তু ফয়সালার পরেও নিজের রায়কে বাকি রাখা ও উহার উপর জমে থাকা ইহাই হচ্ছে নাফসানিয়াত। সাথী রায় দেয় ও ফয়সালাত হয়ে যায়, কিন্তু তাকাজা যদি অন্য কাহারও দ্বারা পুরা করা হয়, তখন ইহার উপরে সবাই অসন্তুষ্ট হয়ে যায় অথচ ইহা আল্লাহ-র তরফ থেকেই হয়।

আজানের ব্যাপারে হুজুর (সঃ) সাহাবাদের সাথে মাশেয়ারা করলেন এবং সবারই রায় শুনলেন, কিন্তু হুজুর (সঃ) কোন ফয়সালা করলেন না। এক সাহাবী ঐ রাত্রে স্বপ্নে একজন ফেরেস্তার নিকট থেকে আজান দেওয়া শিখলেন ও হুজুর (সঃ) মোয়াজ্জেন ঐ সাহাবীকে বানালেন না, আজান দেওয়ার দায়িত্বভার হজরত বেলাল (রাঃ) এর উপর

দিলেন।

কাজ তাহার দ্বারা নেওয়া হবে, যে তাকাজা পুরো করাতে ও কোরবানীতে আগে বাড়বে। ঠিক এই ভাবেই এই মোবারক কাজ উহার দিলের উপর আল্লাহ খুলবেন, যে ফিকিরের মধ্যে আগে বাড়ে। এই ভাবেই এই কাজের সব সাথীর সবকরম যোগ্যতা এক সঙ্গে মিলে এই মোবারক কাজ চলে।

আমাদের মধ্যে জামিয়েত হতে হবে অর্থাৎ দ্বীনের লাইনে যে সমস্ত কাজ হচ্ছে উহাকে আমরা আপন কাজ ভেবে নেব। দ্বীনের লাইনে কোন কাজের খেলাপ হওয়া ইহা আমাদের কাজ নয়।

দ্বীনের সমস্ত কাজের মধ্যে পানি মিলবে এই মোবারক কাজ থেকেই কারণ এ কাজই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কাজ। এই মোবারক কাজকে সাবেত করার জন্য দ্বীনি লাইনের অন্যান্য কাজকে না করে দেওয়া। এটাই হচ্ছে এ কাজের উপর বড় মসিবত। আল্লাহ না করুক আমাদের ভিতর যেন এই জিনিসটা না আসে। আর যদি ইহা হয় অর্থাৎ দ্বীনি লাইনে অন্যান্য কাজকে না করে দেওয়া হয়, তাহা হইলে এই মোবারক কাজ করনেওয়ালারা, তাহা হইলে ইহারাও অন্যান্য সমস্ত তবকার মধ্যে ইহারা একটা আলাদা তবকা বেনে যাবে। যেমন দ্বীনের লাইনে অন্যান্য জামাত আছে এবং তবলীগের জামাতও একটা জামাত হয়ে যাবে। এজন্য বড় হজরতজী, মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলতেন "জামাত" শব্দটাই তো আপেষের মধ্যে বিভেদ জামাতের মধ্যে তকসিম হয়ে আছে। এই মোবারক কাজের নাম "তবলিগী জামাত" উহারাই রেখেছে যাহারা এই কাজকে জানেনা এবং এই কাজের বাইরে আছে। এই জন্য জামাত বেনে নয়, উম্মতি বেনে অর্থাৎ সাথী বেনে কাজ করব। যদি এই কাজও একটা তবকা বেনে যায় তো উহার ফায়দা ও আসর সীমিত হয়ে যাবে, অথচ এ কাজ পুরো উম্মতের জন্য ও সমস্ত মানুষের জন্য।

আমাদের কথার দ্বারা, আমাদের আপোষের লেনদেনের দ্বারা এবং আন্দাজের দ্বারা এ কথা যেন মোটেই না বুঝায় যে, আমরা অপরের থেকে আলগ। এ কাজের মধ্যে আনেওয়ালাদের জন্য সব থেকে বেশি বাধা যে, আমরা উহাদেরকে অন্য লোক বুঝি। অন্য কোন জামাতকে রদ করে দেওয়া ও ইনকার করা, এটা আমাদের এখানে নেই।

কোরান পাকে আল্লাহতায়ালা বলেছেন যে, যাহারা খোদ ছাড়া অন্য কাহরও ইবাদত করে, উহাদের মাবুদগুলোকে তোমরা খারাপ বলবে না, নচেৎ উহারা জিদের মধ্যে এসে আল্লাহকেও খারাপ বলবে, আর উহার জারিয়া তোমরা (হে মোনিনরা) হবে।

হাদীসে এসেছে নিজের বাপকে গালি দিও না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন এ কেমন কথা? নিজের বাপকে গালিদেবে? হাদীসের মাহফুম, হুজুর (সঃ) বললেন তোমরা যখন অপরের বাপকে গালি দেবে, তখন সেও তোমার বাপকে গালি দেবে।

আমাদের এ কাজ তবকাতে নয়। তবকাওয়ালা কাজের মধ্যে বড় বে-উসুলি আছে।

ইহার দ্বারা অনেক মানুষ নির্দ্দিষ্ট বেনে যায় ও খাওয়াস হয়ে যায়। যেমন এই ব্যক্তি ছাত্রদের কাজের জন্য খাস, এই ব্যক্তি মাস্তুরাতের কাজের জন্য খাস। খাওয়াস এই কথাটা বলা, ইহার দ্বারা মাশোয়ারার মধ্যে তোড় পয়দা হয়। আমাদের যত কাজ আছে,যত তাকাজা আছে সমস্ত একটা মাশোয়ারতে নিয়ে এসো।

হজরতজী (রহঃ) বলতেন, যদি তোমরা ফিকিরের দ্বারা, উসুলের দ্বারা কাজ না চালাও, তো তোমাদের সাথীরা একটা একটা তবকার জিম্মাদার হয়ে যাবে। যেমন এই ব্যক্তি এই কাজের জিম্মাদার, যেমন ঐ ব্যক্তি কাজের জিম্মাদার শেষ পর্যন্ত অবস্থা ঐ রকম দাঁড়িয়ে যাবে। অনেক এলাকায় এই রকম হচ্ছে। যেমন খাওয়াসকে আলগ জোড়া হচ্ছে, ছাত্রদের আলগ জোড়া হচ্ছে। অনেকে ইহার মধ্যে ফায়দা বুঝে ও তার নজরে ভাল লাগে। কিন্তু এ ফায়দা সাময়িক, পরে কিন্তু ইহা আসল উসুল থেকে আমাদেরকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেবে।

এই রাস্তায় যে নিজে খাস বেনে চলবে তাহার জেহেনই অন্য বেনে যাবে, সে উম্মতের অংশ বানতে পারবে না। আর ইহাতেই গ্রুপবন্দী হয়। আর ইহা খোদার সাহায্যকে রুখে দেওয়ার বড় কারন বেনে যায়।

আর এই যে হালকা বানানো হয়েছে উহা এই কাজকে সহজ বানানোর জন্য, আপোষের মধ্যে জুদা হওয়ার জন্য নয়। ইহার দ্বারা কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়, কিন্তু ফিকির ভাগ হয় না। কিন্তু যদি ইহার মধ্যেও এই জেহনে বেনে যায় যে,তো এই জেহেন বেনে কাজ করাতো ইহা জন্তু জানোয়ারের জেহেন হল। কুকুরের জেহেন কি? যেমন কোন কুকুর যদি নিজের এলাকা থেকে অন্য এলাকায় চলে যায় তখন ঐ এলাকার কুকুররা চিৎকার করা শুরু করে দেয়। ইহা হচ্ছে কুকুরের খসলত। কারন কুকুররা নিজেদের মধ্যে এরিয়া ও সীমা ভাগ করিয়া লয়। এই রকম জেহেন নিয়ে যদি এলাকা ভাগ করে কাজ করা হয়, তো এই এলাকিয়াত বেনে কাজ করা, ইহা রাজনীতি ও জন্তু-জানোয়ারের মেজাজ, ইহা দাওয়াতের মেজাজ নয়।

আমাদের আপোষের এফতেরপ অর্থাৎ দিলেরফাটল গায়েরী সাহায্যের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আজ উম্মত পেরেশান। মাওলানা সাদ সাহেব বলছেন, আমার তো পুরো এক্কীন, আজকে সমস্ত আলমের মধ্যে বে-চয়নী ও ধ্বংস, বরবাদি ইহার পিছনে আমরা আছি।

ডাক্তার জোড়, প্রফেসারদের জোড়, ইহারা নিজেরা একাকী চলবে,

উম্মতের অন্যান্য লোককে এরা কবুল করবে না। সেই জন্য চিল্লার মধ্যে উম্মতের বিভিন্ন তবকার সাথীকে একসঙ্গে মিলিয়ে মখলুত জামাত বানাও।

হুজুর (সঃ) খাসকে আমের সঙ্গে গরীবদিগকে মালওয়ালার সঙ্গে জুড়ে চালাতেন।

আমেরিকায় আমি গিয়ে দেখলাম, এই মোবারক কাজের সাথীদের মধ্যে কালোদের কাজ আলাদা, হিন্দুস্থানী লোকেদের কাজ আলাদা, আমি উহাদিগকে বললাম, এ কি করলে তোমরা? তোমরা উহাদিগকে অর্থাৎ কালোদিগকে ঘৃনা করে আলগ করে দিলে? উহাদিগকে এক কাছে কর। তখন এই প্রথমবার কালোদিগকে আগে বসানো হল। উহারা কাঁদতে লাগল এবং বলল এত বৎসর পরে এই প্রথমার যে সাদারা কালোদের কাছ থেকে রায় নিচ্ছে। দ্বীনের এই কাজ শেষ কাজ, যার কারনে সমস্ত উম্মতকে জোড়া হচ্ছে। এখন যদি এর মধ্যেও খারাবি আনি এবং এই কাজকে হারিয়ে দিই, তাহলে বাকি আর কি থাকবে?

কোরেশদের সর্দাররা হুজুর (সঃ) এর কাছে এসে বলল, আমরা আপনার সঙ্গে খাস ভাবে মিলিত হতে চাই, যাহার মধ্যে মোহাজির ও আনসারদের গরীবরা থাকবে না, যাহাদের কাপড় চোপড় ময়লা আর চুল গুলো উসকো খসকো। কোরেশরা হুজুর (সঃ) এর কাছে এই শর্ত রাখলো। হুজুর (সঃ) তৈরী হয়ে গেলেন এবং এই ভাবে জমা হওয়ার শর্তের উপরে কোরেশদের সর্দারকে দেওয়ার জন্য এজাজত নামা লেখা হল যে কোরেশদের খাস লোকেদের নিয়ে হুজুর বসবেন, আর সেই মজলিসে কেউ থাকবে না। আর ঠিক সেই সময়ে অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মখতুম হুজুর (সঃ) এর সামনে এলেন। তিনি ছিলেন গরীব, অন্ধ। হুজুর (সঃ) ঐ সময় উহার আসাতে মনে মনে খুব বিরক্ত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে হুজুর (সঃ) কে সাবধান করার জন্য আল্লাহ একটা সুরা নাজেল করলেন (আবাসা ওয়াতাওয়াল্লা আনজা আহুল আ'মা.....ইলা আখিরিহি)। এই খাস মজলিস করার বিরুদ্ধে এই আয়েত নাজেল হল।

হুজুর (সঃ) হজরত আলির কাছ থেকে ঐ এজাজত নামা নিয়ে নিলেন ও ফেড়ে দিলেন এবং আরও কয়েক জায়গায় কোরানে এর উপরে সাবধানবানী এসেছে, যে আপনি এই গরিব, ফকির, আম সাহাবাদিগকে দূরে রাখবেন না।

খাওয়াসরা চাই কাজের মধ্যে যতই আগে হয়ে যাক, উহারা উম্মতের অংশ বানতে পারবে না। উহাদের বসা, ওঠা, চাল-চলন ও নিয়মপ্রণালী আলগই হবে। এই জন্য আমাদের এখানে সবাইকে একসঙ্গে মিলিত করে চালানো, এটা

সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ জিনিস। হ্যাঁ ছাত্রদিগকে বাৎসরিক ছুটির আগে জামাতে বার করার জন্য আলগ জোড়া চলবে, ইহা খাস কোন জোড় নয়। প্রত্যেক মসজিদের সঙ্গে জুড়তে হবে। তবকাওয়ালা কাজ ও তবকাওয়লা জোড় করা হবে না, না উহার জন্য কোন আলগ জিম্মাদার বানানো হবে। সমস্ত কাজ মাশোয়ারার সঙ্গে হবে এবং মাশোয়ারাই হবে সমস্ত কাজের জিম্মাদার। আর ইহার দ্বারাই উন্নতি হওয়া আসবে।

এই কাজের মধ্যে মানুষ নিজের কোরবানীর দ্বারা আগে বাড়ে, যেমন পাখিরা নিজের পরের দ্বারা উড়ে। কোরবানীর দ্বারা ও এখলাসের দ্বারা নিজেকে আল্লাহর কাছে কবুল করাও। এস্তেকামাত পয়দা হওয়ার জন্য এস্তেখলাস হচ্ছে শর্ত অর্থাৎ উহার মতলব নিজেকে শুধুএই কাজের জন্য খালেস করে নেওয়া। ইহার কারনে আল্লাহ উহাকে এস্তেকামাত নসিব করবেন। যে এই কাজকে ছেড়ে দিল, উহার মধ্যে বসিরাত পয়দা হয় নাই বলেই। যে বসিরাত হাসেল করেছে, যে কখনই এই কাজকে ছাড়বে না। বসিরাত মানে "এই কাজ হচ্ছে হক্ক, আমার সমস্ত সমস্যা এই কাজের মধ্যেই সমাধা হবে, এই এক্কীন দিলের মধ্যে পয়দা হওয়া।" ইহাকে বলে বসিরাত।

কাঁকরাইলে (ঢাকা) পুরাতন কর্মীদের মাঝে হজরত মাওলানা ইবরাহিম সাহেব মুদ্দা জিল্লুহুল আলীর মুজাকেরা (উর্দু) তরজমা বাংলা।

৭ই মার্চ,১৯৯৬, সকাল ১০টা ৩০মিনিট।

মেরে পিয়ারে ভাইয়ো, আল্লাহর সব চাইতে বড় নেয়ামত হ'ল আল্লাহর দ্বীন, যেমন জীবনের জন্য আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামাত হল পানি। প্রানীর জীবন, উদ্ভিদের জীবন, জানোয়ারের জীবন পানীর উপর নির্ভর করে। পানি শেষ হয়ে গেলে সব মরে যাবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে কুদরতি ব্যবস্থা। আল্লাহতায়ালা কোরআন পাকে বলেছেন, " আমি সব জিনিসের জীবন পানির মধ্যে রেখেছি।" পানি যেমন জীবনের জন্য বড় নেয়ামত, তেমনি আল্লাহতয়ালা আসমান হতে যে দ্বীন অবতীর্ণ করেছেন তা পানি হতেও বড় নেয়ামত। এই দ্বীন হ'ল জীবনে নিশ্চিন্ত থাকার জন্য এবং জীবনে সফলকাম হবার জন্য। পানি অপচয় করা জায়েজ নেই, (এটা) আল্লাহর হুকুম। এই রকম দ্বীনের ব্যপারেও সীমা অতিক্রম করা চলবে না।

দ্বীন কি জিনিস ভাই? দ্বীন হ'ল (এক) জিম্মাদারী আদায়ের নাম। দ্বীন আল্লাহর (পক্ষ থেকে একটা) আমানত। এটা এত বড় আমানত যে, যখন জমীন ও পাহাড়ের সামনে দ্বীনকে রাখা হয়েছিল তখন এরা এই (আমানত বহন করতে) অস্বীকার করেছিল। মানুষকে (এই আমানত) দেওয়া হলে মানুষ এটা উঠিয়ে নেয়। আল্লাহপাক পানির ব্যাপারে এ কথা বলেছেন যে, আমি আশমান হতে পাক পানি দিয়েছি যাতে পানি তোমাদের পাক করে দেয়। এই রকম ভাবেই দ্বীন মানুষের জন্য জরুরী; দ্বীনও মানুষকে পার করবে। দ্বীন মানুষের জীবনে সর্বপ্রথম মানুষের অন্তরকে পাক করবে। দ্বীন অন্তরকে শিরক, কুফর, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, শত্রুতা, খারাপ ধারনা, (অর্থাৎ বদগুমানী) ইত্যাদি হতে পাক করবে। এই সমস্ত বিষয়গুলো মানুষের অন্তরের স্বভাব।

যখন দ্বীন এলো তো দ্বীন কবুলের জন্য দুই জামাত (তৈরী) হ'ল, এক (জামাত) মোহাজিরিনদের আর এক (জামাতা) আনসারদের। তাদের উভয় দলের উপর দ্বীন প্রভাব ফেলেছিল। মোহা জিরিনদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন যে,

মুহাম্মদ(সঃ) আল্লাহ-র রসুল। তাঁর সঙ্গে যাঁরা আছেন তারা কাফেরদের ব্যপারে বড়ই কঠিন। কিন্তু পরস্পরের ব্যাপারে একে অন্যের প্রতি খুব দয়াশীল।

তৃতীয় গুন এই যে, আপনি তাঁদের রাত্রে পাবেন ইবাদতের মধ্যে, রুকুর মধ্যে, সেজদার মধ্যে; আল্লাহ-র সন্তুষ্টি তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। তাঁদের পরস্পরের ব্যাপারে (কোর্আন পাকে) "রুহামা" শব্দ এসেছে অর্থাৎ তাঁরা পরস্পরের প্রতি বড় রহম করনে ওয়ালা।

দ্বিতীয় জামাত আনসারদের। উহাদের জন্য হুজুর (সঃ) বলতেন, যদি আমার হিজরতের মুয়া'মেলা না হত হবে তবে আমি আনসার হ'তাম। এদের ব্যপারে কি এসেছে? একবার আনসারদের মধ্যে এতরাজ হলো, ঝগড়া হলো, এর পিছনে ইহুদীরা কাজ করেছিল।

মুহম্মদ (সঃ) এর তশরীফ আনার পর হতে আনসারদের ঈমান আনা ইহুদীরা ভাল চোখে দেখতো না। সব সময় শত্রুতা লাগানোর চেষ্টা করতো, বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সমস্যা খাড়া করত। একের কথা অন্যের কাছে লাগাতো।

নবী (সঃ) এর বিবির ব্যাপারে ইহারাই তোহমত দিল, যাই হোক ঝগড়া করা খারাপ, শরিয়তে এটা নিষেধ করা হয়েছে। শবে ক্বদর -এর নির্দিষ্টতা ঝগড়ার কারনে উঠে গেলে দুজনের ঝগড়া দেখে হুজুর (সঃ) এর দিল হতে উহা উঠিয়ে নেওয়া হলো। তো যখন আনসারদের ও মোহজিরিনদের মাঝে ঝগড়া বাধে;মারামারি হয়, হুজুর (সঃ) এর নিকট খবর যায়। তৎক্ষণা? হুজুর (সঃ) ঐখানে তশরিফ নিয়ে যান এবং আনসারদের বলেন, কি হলো? আমি কি তোমাদের মাঝে এখন মত্তজুদ নেই? আর তোমাদের এই অবস্থা? হুজর (সঃ) তাদের বোঝান। আনসাররা বুঝতে পারে, "আমরা শয়তানের চক্রে পড়েছি"। তারা বলতেন, আমরা প্রতারিত হয়েছি। তখন তারা খুব কান্নাকাটি করেন, আপোষে গলাগলি করে মাফ চান এবং আল্লাহ-র তরফ হইতে আয়ত নাজেল হল যার মতলব এই যে, পূর্বে তোমরা শত্রুভাবা পন্ন ছিলে; বছরের পর বছর লড়াই করে আসছিলে; আর দ্বীন এলো, দ্বীন তোমাদের পরস্পর শত্রুতা খতম করে দিল।" দ্বীন আসলে তার কারনে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালাবাসা সৃষ্টি করে দিলেন। আর তোমরা আনসাররা এই নেয়ামাতের কারনে একে অন্যের ভাই হয়ে গেল।

নেয়ামত কি? দ্বীন আর মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ মোহাজিরিনদের বললেন, একে অন্যের উপর রহম করনেওয়ালা (রুহামা); আর আনসারদের বললেন একে অন্যের ভাই। এই দুই নাম এসেছে যে, দ্বীন আসার কারনে মোহাজিরিন একে অন্যের উপর রহম করনেওয়ালা হয়ে গেলে আর দ্বীন আসার কারনে আনসারা একে অন্যে ভাই হয়ে গেল।

এই মুজ্যকারা আমি এজন্য করলাম যে, দ্বীন আসার কারনে দ্বীনদারদের মধ্যে এই সত্যিকারের প্রভাব সৃষ্টি হওয়া জরুরী। যদি সূর্য উঠে তবে কি প্রভাব হবে? আলো বের হবে। এটাই সূর্য ওঠার সত্যিকারের প্রভাব। এটা হতে পারে না যে, সূর্য উঠল, কিন্তু

আলো বের হল না। তো দ্বীন আসতে হলে আমাদের মোয়ামেলাও মোয়াশেরাতের মধ্যে, আমাদের রেহেন সেহেনের মধ্যে পরস্পরের প্রতি দয়াশীলতা ও ভাতৃত্ববোধ আসা জরুরী। এটা প্রথম সিফত যা দ্বীন কবুলকারীদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে সৃষ্টি হয়। তাই মেরে ভাইয়ো, দ্বীন যে প্রভাব ফেলল তা হ'ল (এই যে) অন্তর পাক হয়ে গেল। দ্বীনের কারনে একে অন্যের প্রতি রহম ও পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়ে যাবে। যদি দ্বীনকে সাহাবা (রাঃ) দের ধারায় নেওয়া হয়, যেমন নিজে মেহনত করি, নিজে কুরবানী দিই এবং নিজের সংশোধনের ফিকির করি, যদি এই ভাবে দ্বীনকে নেওয়া হয় অর্থাৎ নিজের সংশোধনের ফিকির করা। নিজেকে মেহনতে লাগানো, নিজেকে কুরবানীতে লাগানো, তাহলে দ্বীন এই রকমই প্রভাব ফেলবে অর্থাৎ জীবনের মধ্যে আল্লাহতায়ালার হুকুম জিন্দা হবে, অন্তরের বিগাড় বের হয়ে যাবে।

আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) পরবর্তী লোকদের এই কথা বলিতেন, "ভাই যদি তোমাদের দ্বীন নিতে হয় এবং দ্বীনের রাস্তায় চলতে হয় তবে ঐ সকল লোকেদের রাস্তায় চলো যারা তোমাদের আগে চলে গেছেন অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ) এর সাহাবারা। তাঁদের রাস্তার উপরে চলো, এই রাস্তা সঠিক রাস্তা। তাঁদের মাঝে কি ছিলো? তাঁদের মাঝে কতক গুলো জিনিস ছিল, তাঁহারা অন্তরের দিক থেকে অনেক পাক-সাফ ছিলেন। তাঁহাদের অন্তর ছিল অনেক নেক ও অনেক পাক ছিলো। তাঁহাদের অন্তর ছিল দুনিয়ার মহব্বত থেকে পাক, পরস্পরের শত্রুতা এবং ঝগড়া হতে পাক, লোক দেখানো, হিংসা, খারাপ ধারণা করা হতে পাক। সাহাবারা একে অপরের সম্পর্কে খারাপ ধারনা পোষণ করতেন না। ঐ সকল লোক এই রকম ছিলেন যাঁরা অন্তরের দিক হতে খুব পাক ছিল, একে অন্যের সম্পর্কে কখনও খারাপ ধারনা করতেন না।

এক সাহাবী (রাঃ) বলতেন, ইত্তাহিমু আনফুসাকুম হে লোকেরা নিজেকে নিজে সবসময় অপরাধী মনে করো, অন্যের জন্য নয়, নিজের জাতকে মুত্তাহাম মনে করো। কোন ব্যাপারে ত্রুটি দেখা দিলে নিজেকে অপরাধী মনে করো, অন্যকে নয়। এর মধ্যে আমারই অপরাধ হয়েছে। এটা হলো নেক লোকদের স্বভাব, যে যখনই কোন কথা হয়, তখনই তারা নিজেকে অপরাধী মনে করে। আমরাই পক্ষ হতে কোন ত্রুটি হয়েছে, এটা আমার অপরাধ। পাক দিলওয়ালারা নিজেদেরকে এই রকম মনে করেন। সহজ রাস্তা হলো, ভাই অপরাধ কর? (উত্তর) ভাই অপরাধ আমার।

যে নিজেকে অপরাধী বলে মনে করে তার অপরাধ মাফ করা হয়। আল্লাহতায়ালাও মাফ করে থাকেন। হাদীসে এসেছে "যদি কেউ বলে, হে প্রভু, আমার গোনাহ হয়েছে, আমাকে মাফ করে দেন, তাহলে আল্লাহতায়ালাও ফরমান যে, এই বান্দার এক্কীন আছে যে, আমি তার পরওয়ারদেগার এবং আমি গোনাহ মাফ করে থাকি, এজন্য সে আমার কাছে এসেছে, আর আমিও তাকে মাফ করে দিলাম।" সুতারং তার অপরাধ মাফ হয়ে যায়। শুধু

মাফ হবে এটাই নয় আল্লাহতায়ালা ঐ সমস্ত লোককে খুবই পছন্দ করেন যারা আল্লাহর নিকট অপরাধী হয়ে আসে। আর আল্লাহতার অপরাধ মাফ করে দেন। ভাই বান্দা তো অপরাধ করবেই, সে অপরাধী হয়ে আসবে আর আল্লাহমাফ করে যাবেন। তবে এই লোক আল্লাহর রহমত পেতে থাকবে। এজন্য আসল কথা হলো, এটা মনে করা যে, ভাই, আমারই অপরাধ। কোন কাজ নষ্ট হয়েছে তো ভাই আমারই অপরাধ। দোষারোপ কার উপর? উত্তর, নিজের উপর। সব কিছুর সমাধান হওয়ার এটাই হচ্ছে সহজ রাস্তা।

জুন নুন মিশরী (রহঃ) এক বুজুর্গ ছিলেন। তাঁর জামানায় একবার মিশরে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। লোকজন খুব দোওয়া করতে থাকে, পাহাড়ে পাহাড়ে গিয়ে দোওয়া করতে থাকে। সাধারণ মানুষের স্বভাব হলো যে, তারা নেক লোকেদের নিকট গিয়ে দোওয়া চায়, তাই সমস্ত লোকজন তাঁহার নিকট গেল এবং দোওয়া করতে বললো যে, আপনি আল্লাহ-র প্রিয় বান্দা, আপনি দোওয়া করলে দোওয়া রদ হবে না। বৃষ্টি নেই, মখলুক বড় পেরেশান, লোকজন তার নিকট দোওয়া করাতে গেলো, আর তিনি মিশর ছেড়ে মাদীয়ান চলে যাচ্ছিলেন, লোকজন বলল, এটা কেমন কথা যে, আমরা আপনাকে নিয়ে দোওয়া করাতে আসলাম আর আপনি মাদিয়ান চলে যাচ্ছেন? উনি উত্তর দিলেন, আমি কিতাবের মধে পড়েছি যে মঘলুকের উপর যখন রুজির সংকীর্ণতা আসে তা গোনাহগারদের গোনাহের কারনে। আমিই তো গুনাহগার। আমার চেয়ে বড় কোন গোনাহগার এই দেশের মধ্যেই নেই। তাই আমি এই দেশ হতে সরে যাই যাহাতে এদের উপরে আল্লাহর রহমত আসে। উনি তো মিশর ছেড়ে মাদীয়ান চলে গেলেন, আর এদিকে বৃষ্টি হয়ে গেল।

এই ঘটনা লেখার পরে লেখক লিখেছেন যে, আল্লাহ-র নেক বান্দারা সব সময় নিজেদের কে এই রকমই মনে করে থাকেন। কখনও এইকরম মনে করেন না যে আমি নেককার পা বন্দ; তাঁরা মনে করেন যে, আমারই অপরাধ, হয়তো আমমার গোনাহের কারনে রহমত বন্ধ হয়ে গেছে, তাই আমি সরে যাই, যাহতে আল্লাহ-র বান্দারা রহমত পায়। যে নিজের প্রতি দেখে সে তো নিজের অপরাধ স্বীকার করে মাফ চাইবে, তা না হলে মনে করে, আমি তো অপরাধ করি নাই, সে তো মাফ কখনই চাইবে না। এই হল রাস্তা।

সাহাবা (রাঃ) দের অন্তর অনেক বেশী পাক-সাফ ছিল। ভাই আমার কথা বুঝছেন তো? আমি প্রথম গুন বর্ণনা করলাম যে, সাহাবাদের অন্তর বহুত পাকসাফ ছিল। অন্তরের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন পাক সাফ। এই জন্য প্রথম শর্ত এই যে, যাঁহারই দ্বীনের কাজ করবে, প্রথম তাঁহাদের অন্তরকে যথেষ্ট পাক-সাফ রাখা চায়।

সাহাবা (রাঃ) দের এলেমের গভীরতা ছিল অনেক বেশী। হুজুর (সঃ) এর নিকট হইতে হকীকতের সাথে এলেম অর্জন করেছেন। এলেমে গভীরতা ছিল বেশী। কোন লোক দেখানো বা কৃত্রিমতা (তাকাল্লুফাত) তাঁদের জীবনে ছিল না। তাঁদের গুন এই ছিল, তাঁদের অন্তর ছিল পাক; অন্তরে ছিল ইলমের গভীরতা লোক দেখানো কোন কিছু থাকে

নাই; ভিতর বাহির একই রকম। আসলে সাহাবা (রাঃ) গন একদল ছিলেন যাঁদের আল্লাহপাক আপন নবীর দাওয়াতের কাজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে এই গুনগুলী ছিল। এই জন্য লোকজনকে বলা হয়েছে যে, তোমরা নিজেদেরকে সাহাবাদের মত বানাও। কেন বানাতে হবে? এই কারনে যে আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) কসম খেয়ে বলেছেন যে, এই সকল লোকেরাই সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর ছিলেন।

এক ধরনের পোকা আছে যা কাঠের ভিতর গিয়ে কাঠকে খেয়ে ফেলে। একে ঘুনের পোকা বলে, ঠিক এই রকমই শয়তান দ্বীনের সম্পদকে ভিতর হতে নষ্ট করে দেয় ইবাদতকে এবং এস্তেমাইয়াতকে ভিতর হতে নষ্ট করেদেয়।

যেমন হাদীশ শরীফে এসেছে যে রিয়াকারী এবং আগরাজ সৃষ্টি হয়ে গেল উপরে তো ইবাদত হিসাবে দেখা যাবে তেমনি উপরে তো দ্বীনের কাজ হিসাবে দেখা যাবে, কিন্তু ভিতর হতে উহা নষ্ট হয়ে গেছে। তখন আল্লাহতাবারাকতালা এই মেহনতের আর মূল্য দেবেনে না। যেমন বাদামকে ভিতর হতে খেয়ে ফেলা হলে; তাহলে কে উহার জন্য পয়সা দেবে? বরং বিক্রেতা ও ঐটাকে আর বিক্রয় করতে পারবে না। কারণ এর মধ্যে তো আর বাদামই নাই। এইরকম ভাই দ্বীনের কাজ ভিতর থেকে যখন খারাপ হয় অন্তরের খারাবীর কারনই হয়। কিসের কারনে? অন্তরের খারাবীর কারনে। অন্তর যদি অন্য কিছুর প্রতি চলে যায় তখন আমলও ঐ জিনিসের প্রতি চলে যাবে। অন্তর যদি দুনিয়ার দিকে পড়ে যায় তখন মানুষ ঐ দুনিয়ার জন্যই ইবাদত করবে। যথা নামের জন্য করবে, দামের জন্য করবে ইত্যাদি। অতএব শয়তান যে নষ্ট করবে তা ভিতর থেকে নষ্ট করবে, উপর থেকে নয়। উপরটা ঠিক থাকবে অর্থাৎ আমল ঠিক থাকবে।

দ্বীনদারদের কাতারকে এবং দ্বীনদারদের এজাতামাইয়েতকে ভাঙার জন্য শয়তানের কাছে একটা জিনিস আছে। আর এই উম্মতের এজতামাইয়েও শেষ হয়ে যাওয়া ইহা উম্মতের জন্য আজাব। ভাই আমার কথা বুঝতে পারছেন তো? উলামায়ে কেরামরা লিখেছেন যে উম্মতের এজতামাইয়েতকে শেষ করার যে বিষাক্ত ঔষধ শয়তানের কাছে আছে তা হলো মানুষের একে অন্যের উপর কু-ধারনা করিয়ে দেওয়া। "এক অন্যের প্রতি কু-ধারনা পোষণ করা। যখন এই রকম হবে তখন একের অন্যের প্রতি কদর কমে যাবে। যখন একের অন্যের প্রতি কদর কমে যাবে তখন একে অন্যের নিকট হতে আর উপকার নিতে পারবে না এবং একে অন্যের উপর থেকে নজর পাল্টে যাবে। নজর নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারন হলো অন্তরের মধ্যে কু-ধারনা পয়দা হয়ে যাওয়া। যখন নজর বদলে যাবে তখন অন্যের দোষ গুলো নজরে আসবে এবং খারাবীগুলিতে দৃষ্টি পড়তে থাকবে। আর এটা দ্বীনের মেজাজ নয়। যে একে অন্যের খারাবী দেখুক। দ্বীনের মেজাজ কি? উহা হল একে অন্যের ভাল গুন দেখবে। মাওলানা মহম্দদ ইলিয়াস (রহঃ) বলতেন যে, আমাদের দাওয়াত ও তবলীগের কাজ তো ভাল গুনের লেনদেন। যেমন দেখো ঐ লোকের মধ্যে কি

গুন আছে এবং ঐ লোকটা মধ্যে কি গুন আছে আর একটা দেখ ঐ লোকটার মধ্যে কিন গুন আছে। তাহলে ভাল গুনগুলো প্রসার লাভ করবে। দ্বীন তো ভাল জিনিসের নাম। খারাবীর নাম নয়। অতএব কুধারনার কারনে যখন নজর বদলে যাবে তখন শুধু খারাবগুলিই চোখে পড়তে থাকবে। যদি বিবির প্রতি কু-ধারনা এসে যায় তখন বিবির সব দোষ গুলি চোখে পড়তে থাকবে।

যদি পার্টনারের প্রতি কু-ধারনা এসে যায় তখন পার্টনারের শুধু দোষগুলো চোখে পড়তে থাকবে। যদি জামাতের সাথীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কু-ধারনা এসে যায়। তখন একে অন্যের দোষগুলি দেখতে থাকবে। আর যখন কারও সম্বন্ধে কু-ধারনা অন্তরে এসে যাবে তখন ঐ ব্যক্তি তার ঐ ধারনা সত্যি কিনা যাচাই করা শুরু করে দেবে এবং তার দোষ গুলো তালাস করতে থাকবে।" একে বলা হয় গুপ্তচরবৃত্তি (তাজাস্সুশ)। যখন সাথীর প্রতি খারাপ ধারনা জম্মে যাবে তখন তাজাসসুস্ অর্থাৎ গুপ্তচর বৃত্তিও জম্মে যাবে। অর্থাৎ তখন সে দেখে সত্যিই কি সাথীটা এই রকম। চুপে চুপে দেখতে থাকে। আর যদি কোন একটা জিনিস তার ধারনা সাথে মিলে যায় তখন তার আলোচনা শুরু করে দেয় যে দেখ আমি বলছিলাম না যে সে এই রকম? এই ভাবে তিন ধাপ হবে। প্রথম হলো কু-ধারনা, তারপর হল গুপ্তচর বৃত্তির শুরু, তারপর হলো আলোচনা অর্থাৎ গীবীত শুরু হয়ে গেল। আর এই জিনিসটা তরতীরের সাথে হবে। কোরানের মধ্যেও এই ভাবেই তরতীব এসেছে। এটা মোয়াশেরার বিষয় অর্থাৎ একে অপরের সঙ্গে থাকা ওঠা বসার বিষয়, নামাজ, রোজার বিষয় নয়। এটা রহন সহনের বিষয়। বিনা ওজুতে নামাজ পড়া কেমন? যেমন নাকি উহা কুফর। বিনা ওজুতে নামাজ পড়াকে উলামারা লিখেছেন এটা কুফর, এটা নামাজের মশালা আর অপরের উপর কু-ধারনা করা। ইহা কিসের মশলা? ইহা পরস্পরের রেহেন সহেনের অর্থাৎ অপরের সাথে থাকা, ওঠা-বসার মশালা। আর রেহেন সেহেনের বিষয়ে,একে অপরের উঠা বসার বিষয়, একে অপরের উঠা বসার বিষয়ে এই জিনিসটা অর্থাৎ একে অপরের উপর কু-ধারনা করা নিষেধ করা হয়েছে। এই তিনটে জিনিসকে আল্লাহতায়ালা তরতীবের সাথে কোরান পাকে বলেছেন, "হে ঈমানওয়ালারা, অনেক ধারনা খারাপ নিজেকে বাঁচাও ইহা হইতে আর তালাশ করো না অন্যের দোষকে। এবং অন্যের দোষ নিয়ে আলোচনা করো না। অমুক লোক এই করম, তমুক লোক ঐরকম।" ইহা করবে না। ইহার দ্বারা মোয়াশেরাত রেহেন সেহেন, একে অপরের সহিত থাকা,উঠা বসা, এই জিনিসটা ভিতর হতে নষ্ট হয়ে যায়। এর জিনিসটা ভিতর হতে নষ্ট হয়ে যায়। এর নগদ শাস্তি এই যে পরস্পরের মধ্যে অন্তর ফেটে যাবে, অন্তর একে অপরের সাথে আর জুড়বে না। এটাই এই উম্মতের উপর নগদ শাস্তি। এর জন্য তওবা করার কথা আল্লাহ জানিয়েছেন যাতে কেহ একে অপরের উপর গীবত না করে। তোমরা কি কেহ একে অপরের মৃত ভাইয়ে গোস্ত খাওয়া পছন্দ করো? তোমরা তো তা পছন্দ কর না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। অবশ্যই

আল্লাহ তওবা কবুলকারী এবং দয়া প্রদর্শনকারী। মোয়শেরাতে এবং অপরের থাকা ভালবাসার মধ্যে। উপরের উল্লিখিত খারাপ জিনিসগুলো এসে গেলে অন্তর ফেটে যায়। দ্বীনদারদেরও অন্তর ফেটে যায়। দুনিয়ারাদারদের অন্তর তো দুনিয়ার কারনে ফেটেই থাকে, আর উপরোক্ত কারনে দ্বীনদারদের অন্তরও ফেটে যায়। অন্তরের বন্ধন তৈরী হয় পরস্পরে একে অন্যের প্রতি কদর করার দ্বারা। অন্তরের বন্ধন এই উম্মতে জন্য আল্লাহ-র তরফ থেকে এত বড় পুরস্কার যে দুনিয়ার কোন কিছু ইহার মূল্য আদায় করতে পারবে না। যেমন কোরানে এসেছে হে মহম্মদ (সঃ) আপনি যদি দুনিয়ার সব জিনিস খরচ করে দিতেন তবু একে অপরের অন্তরকে একত্রিত করতে পারতেন না এটা তো আল্লাহই করে দিয়েছেন। মোহাজিরিন ও আনসারদের মধ্যে মিল মহব্বত তো আল্লাহ-ই তৈরী করে দিয়েছেন অন্যথায় সারা দুনিয়ার দৌলত খরচ করলেও এটা হত না। অন্তরের মধ্যে একে অন্যের প্রতি কদর করা উলফত মহব্বত সৃষ্টি হওয়ার আল্লাহর তরফ হতে এক বিশেষ পুরস্কার। ইহার জন্য আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট এর জন্য দোওয়া করা কারন ইহা তো অনেক মূল্যবান জিনিস।

সুতারং ভাই দ্বীনের প্রভাব হচ্ছে এই যে যখন মানুষ ঈমান এবং আমলে সালেহার সঙ্গে চলবে তখন আল্লাহ তাদের জন্য আপোষে মহব্বতের ব্যবস্থা করবেন। ঈমান ও আমলে সালেহার জন্য অন্তরের মধ্যে পরস্পরের মহব্বত সৃষ্টি হবে। এখন কেন সৃষ্টি হচ্ছে না? কারণ শয়তান খারাপ ধারনা পয়দা করে দিয়েছে। শয়তানের রাস্তা, নবীদের রাস্তা ভিন্ন। যদি নবী এবং সাহাবাদের তরীকায় মেহনত হয় তবে মহব্বত সৃষ্টি হবে। আল্লাহতায়ালার যে সাহায্য আসে তা অন্তর সমূহের বন্ধনের কারনে। পরস্পর অন্তর যদি এক হয়ে যায় তবে আল্লাহর সাহায্যে আসবেই। পরস্পরের অন্তর এক হয়ে যাওয়া বহুত বড় জিনিস। অন্তর এক হয়ে যাওয়া বহুত বড় জিনিস, অন্তর এক হওয়ার বাধা হ'ল, একে অপরের উপরে খারাপ ধারনা পোষণ করা এবং মানুষের নিজের রায়ের উপর জবরদস্তি (এসরার) করা এবং অন্যের কথা গ্রহন করতে অস্বীকার করা। এই সকল বিষয় অন্তরকে এক হতে দেয়ে না। সেইজন্য বলা হয় জবরদস্তি করো না। হতে পারে আমার কথাই ভুল, অপরের ঠিক। আমি রায় দেবার জিম্মাদার রায় দিয়েছি। যদি কবুল না হয় তো জবরদস্তি নাই। যদি জবরদস্তি করা চলে যায় তবে অন্তর এক হয়ে যাবে নচেৎ খারারী সৃষ্টি হবে।

যদি সে আমাকে না মানে তবে আমি তাকে মেনে নি, যাতে করে কাজ চলুক। একবার আমার ইবনে আশ (রাঃ) কে আমীর নিযুক্ত করে একটা জামাত পাঠানো হল। পরে তাদের সাহায্যের প্রয়োজন হল। তিনি সাহায্য চাইলেন। তাঁদের সাহায্যের জন্য দ্বিতীয় জামাত তৈরী হল। এই জামাতে বড় বড় লোকেরা ছিলেন হজরত আবুবকর (রাঃ) হজরত ওমর (রাঃ), হজরত আবু ওবায়াদার (রাঃ), হুজুর (সঃ) এই দ্বিতীয় জামাতের আমীর আবুওবায়দার (রাঃ) কে বানিয়ে পাঠাইলেন। দুই জামাত একত্রিত হল। আমর ইবনে আস (রাঃ) তখন বললেন যে, আপনারা আমাদের সাহায্যের জন্য এসেছেন; এখন জামাত

একত্র হয়ে একটা জামাতা হ'ল, আর আমীর আমি। লোকেরা বললেন যে, আবুওবায়াদা মোহাজিরিন, আসাবায়ে মোবাশশারা আওয়ালীনদের মধ্যে। অতএব উনিই আমীর হবেন। আপনি উনার অধীনে হয়ে যান। আমর ইবনে আস বললেন যে না ইহা হবে না। কারণ আমার জামাত প্রথম এসেছে। এখন এই সমস্যা খাড়া হয়ে গেল। তখন আবুওবায়দা বললেন, ভাই তুমিই আমীর থাকো আমি তোমার অধীনে হয়ে যাই। যদি এমন না হয় তাহলে "ইয়াদ খুলুনান্‌নাসা" বাইনি ও বায়নাক" হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমার এবং আমার মাঝে মানুষ ঢুকে যাবে।

ইহার দুটি অর্থ (হতে পারে), একটা অর্থ হল যে, তোমার এবং আমার মধ্যে মত বিরোধ হবে। ফলে কিছু লোক আমার সাথে হবে, কিছু লোক তোমার সাথে হবে, দুটো পার্টি হয়ে যাবে, ফলে কাজ তখন বন্ধ হয়ে যাবে আর পার্টিবাজি শুরু হয়ে যাবে। পার্টিবাজিতে দ্বীন তো চলতে পারে না। এজন্য উম্মতকে বিভক্ত করা ঠিক নয়।

দ্বিতীয় অর্থ হ'লো তোমার আমার মাঝে কিছু লোক থাকবে যারা তোমার কথা এসে আমাকে বলবে আর আমার কথা তোমাকে বলবে। কথা কি বলবে? তাহা এই যে, আবুওবাইদা এই বলেছিলো, এই চিন্তা করে ছিলো আপর দিকে আমর বিন আস এই বলেছিলো, এই চিন্তা করেছিল। তার ওখানে এই হচ্ছে, ওর ওখানে এটা হচ্ছে। এই সকল লোক আমাদের কে দোলাতে থাকবে। পরে ঝগড়া হয়ে যাবে। আর আমি এই ক্ষতি বরদাস্ত করতে পারবে না। এই জন্য আবু ওবইদা (রাঃ) বললেন ভাই, তুমি আমাদের সবার জিম্মাদার থাকো অথচ আবুওবায়াদার (রাঃ) পুরাতন আর আমরাবিন আশ (রঃ) নূতন তবুও আবুওবাইদা (রঃ) কথা মেনে নিলেন এবং নিজেকে ছোট বানিয়ে নিলেন। ফিরে আসার পরে এই ঘটনা হুজুর (সঃ) এর খেদমতে গেল। তো হুজুর (সঃ) বললেন আবু ওবয়দা (রঃ) তো ঠিকই কাজ করেছে এবং রসুল করিম (সঃ) ফরমালেন ভবিষ্যতে জিম্মাদার আমি মোহাজিরিনদেরই বানাবো। কারণ তাদের মোর্ত্তবা তো অনেক উচুঁ। আর আবু ওবাইদা বড় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ নিয়েছেন। হুঁশিয়ারীর সঙ্গে চলেছেন যাতে করে কাজ চলতে থাকুক আর অন্য কোন জিনিস মাঝখানে প্রবেশ না করে

এ জন্য ভাই একজন যদি আমাকে না মানে তো আমিই তাকে মেনে নিই, যাতে করে বিরোধ সৃষ্টি না হয়, তাকে বড় থাকতে দাও যাতে করে কাজ চলতে থাকুক। এই সম্বন্ধে আর একটা ঘটনার কথা শুনুন।

হজরত ওসমান (রাঃ) তার খিলাফতের জমানায় যখন হচ্ছেজ গিয়েছিলেন তখন তিনি মীর্নাতে যোহর আসবের নামাজ চার রাকাত পড়েছিলেন। অথচ মদীনা থেকে হজ করতে এসেছেন, মুশাফিরের হালত। হুজুর (সঃ) দুই রাকাৎ পড়েছেন, হজরত আবুবকর (রাঃ) দুই রাকাত পড়েছেন, হজরত ওমর (রাঃ) দুই রাকাত পড়ে ছেন আর তিনি চার রাকাত পড়লেন। যখন নামাজের সময় হলো তো সাহাবী আবু জর (রাঃ) অথবা আবদুল্লাহ

ইবনে মাসউদ (রাঃ) হবে "ইন্নালিল্লাহে পড়লেন আর এই ইন্নলিল্লাহে পড়নেওয়ালারাচার রাকাত পড়লেন। লোকজনে বলল আপনি ইন্নলিল্লাহ পড়লেন হুজুরের সুন্নতের খেলাপ কাজ হল বলে, আর নিজে কেন চার রাকাত পড়লেন? উত্তর দিলেন আমার আমীর চার পড়েছেন, আমিও চার পড়বো। আমি যদি এখতেলাফ করি বা অন্য কিছু বলি তবে ইহা উম্মতের জন্য বড় শক্ত কথা হবে। এ জন্য আমি আমীরের সাথে, তিনি নিজের দলিল, কথা, সব ছাড়লেন, কারণ বিরোধ যাতে না হয়। এই হল সাহাবা (রাঃ) দের এখলাস। আমার রায় কোন জিনিস নয়। উম্মতের মধ্যে এজতামিয়েত সবচেয়ে বড় জিনিস। আমীরের সামনে কোন মসলেহাত ছিল যার কারনে তিনি এইরকম করেছেন। উনি যেনে শুনেই চার পড়েছেন তো আমিও আমীরের সঙ্গে হলাম।

আপোষে বিরোধ (এখতেলাফ) তো হবেই; কেননা আল্লাহ এক একজনকে এক এক মেজাজ এক এক রঙে পয়দা করেছেন, তো এদের রায়ের মাঝে অবশ্যই বিরোধ হবে, কিন্তু তাই বলে এখতেলাফ অন্তর ফেটে যাওয়া কোন সময় জায়েজ নয়। এই জন্য মাশওয়ারাহ এমন হবে যে আমার এই রায়, তার এই রায়, সব রায় আসবে। তখন সব দিক গুলো খুলে যাবে, বিরোধ তো হবেই, কিন্তু তাই বলে এফতেরাক হবে না কারন এফতেরাক না জায়েজ। এতে অন্তর ফেটে যায়,যখন এসবার এবং অস্বীকার এলো তখন নবুয়তো কাজ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। নুহ (আঃ) এর সামনে এই বাধাই ছিলো। কওম নিজের কথার উপর জবরদস্তি করল,নবীর কথার অস্বীকার করলো। নুহ (আঃ) বললেন," হে আল্লাহ এরাতো আমার কথা চালাতে দেয় না এবং আমার কথা শুনেও না,এরা সবাই ক্ষতির রাস্তায় চলছে, আর ইহারা নিজেদের কথার উপর এসরার করছে, জবরদস্তি করছে,আর হকও মানছে না, তখন এরা নুহ (আঃ) এর সাড়ে নয়শত বৎসরের মেহনতের উপর পানি ফেলে দিল। তখন আল্লাহ এদের উপর পানি ফেলে দিলেন অর্থাৎ ডুবিয়ে দিলেন

এজন্য জবরজস্তি না করা,হতে পারে আমার সামনের লোকের কথাই ঠিক, আমারটাই ভুল। হতে পারে আমারটা সহি, ওদেরটা ভুল মতবিরোধের ফলে বেশি থেকে বেশি তরতীরের পার্থক্য হতে পারে কিন্তু কাজ তো চলতে থাকবে। ওহোদের ময়দানে গিয়ে লড়াই করার ব্যাপারে নওজোয়ান সাহাবীরা জবরদস্তি করলো। ইয়া রসুলুল্লাহ (সঃ) আমরা তো ওহোদের ময়দানে গিয়েই লড়ব। হুজুর (সঃ) এর রায় ছিল যে ওখানে যেও না। শহরের মধ্যে থাকো এবং এখান থেকে ওদের সাফাই করো। এটা নবীর রায়, কিন্তু নওজোয়ানরা বলল আমরা তো ঐখানেই যাবো অর্থাৎ ওহোদে কারণ আমরা বদরের যুদ্ধে শরিক হতে পারি নি। হুজুর (সঃ) তাদের কথা মেনে নিলেন, নিজের রায় ছেড়ে দিলেন, বড় বড় সাহাবারা ছোটদের বোঝালেন যে তোমরা হুজুর (সঃ) এর মনসা বুঝলে না, তাঁর বাইরে যাওয়ার মত নেই। তোমাদের জবরদস্তির কারনে মেনে নিয়েছেন। হুজুর (সঃ) তাদের কথা মেনে নিয়ে ঘরে চলে গেছেন আর বড় বড় সাহাবারা ছোটদের বোঝালেন।

তখন নওজোয়ানদের নাদামত ও পস্তানি হল। যখন হুজুর (সঃ) যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এলেন তখন নওজোয়ানরা মাফ চাইল যে,হুজুর আমরা আর বাইরে যাব না, আমরা তো আপনার সাথে এইখানেই থাকবো। হুজুর (সঃ) বললেন নবীরা যখন যুদ্ধাস্ত্রে পরে নেয় তখন কাজ শেষ না করে খোলে না। চলো আমাদের ঐখানেই যেতে হবে। নবী নিজেদের রায় ছেড়ে দিয়েছেন কারণ সাথীদের নিয়ে চলতে হবে। এর ফলে জোড় সৃষ্টি হয়েছে। আর যখন জোড় সৃষ্টি হবে তখন আল্লাহর সাহায্য সঙ্গেই থাকবে।

সাথীর প্রতি না কদরী হলে অন্তরের মধ্যে ময়লা আসবে। বে-উসুলি না করা শারিয়তের খেলাফ না চলা, দাওয়াতের উসুলের খেলাপ না চলা, ভুল হয়ে যায় তো মাফ চাওয়া ভুল তো হবেই, গোনাহও হয়ে যাবে, কারণ মানুষ তো, মাফ চাও, মাফের দরজা খোলা আছে। আল্লাহওয়ালা মাফের দরজা খুলে রেখেছেন। পরস্পর পরস্পকে মাফ করো, মাফ চাও, কারণ বে-উসুলি হবে। বে-উসুলি হলে অন্তর ময়লা যুক্ত হবে। পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে বে-উসুলি করা হলে (ক্রাধ) (গাইজ) বাড়ে। কি বাড়ে? গাইজ এর মানে গরমী। অন্তরের মধ্যে গরমী বাড়তে থাকবে। একে গাইজে কলব (অন্তরে ক্রোধ) বলে। এই গরমী সব জিনিসকে জ্বালিয়ে দেয়। এখলাস বাকি থাকে না। হামদর্দী, ইনসাফ বাকি থাকে না। ইনসাফ কি বলে তা দেখবে না; হামদরদী কি বলে তা দেখবে না এবং এখনাসও খতম হয়ে যায়। অন্য দিকে গরমী ভিতরে ভিতরে বাড়তে থাকে, আর ইহা হতেই কিনা সৃষ্টি হয়। কিনা ভিতরে সৃষ্টি হয়। কিনা কি জিনিস জানেন? মুসলমানের প্রতি মুসলমানের লুকায়িত অন্তরের রাগ হল কিনা। শুধু ভিতরে ভিতরেই থেকে যায়, কিছু বলতেও পারে না, কোন বদলাও নিতে পারে না, সবই ভিতরে ভিতরে হতে থাকে, ইহাকে বলে কিনা ইহা হারাম।

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন যখন কোন ব্যক্তি কিনা সহ মারা যায় তখন করবে ঐ কিনাকে বিছের আকৃতি দেওয়া হয়। তখন অন্তরের গরমে বিছেও গরম হয়ে যায়। এজন্য মুসলমানদের প্রতি হুকুম হলো মাফ করে দাও। যদি আমার সাথে কেহ বাড়াবাড়ি করে তবুও তাকে মাফ করে দাও। যে মাফ করবে আল্লাহ তাকে ইজ্জত দেবেন। এটা আল্লাহ-র কানুন। "যে মাফ করল মোয়ামেলা ঠিক করল তার বদলা ও পুরস্কার অল্লাহর জিম্মায় হয়ে গেল"। এই মশলা লোকেদের ইজ্জত আল্লাহ বাড়িয়ে দেবেন। এটাই দস্তুর। বে-উসুলি হলে ভিতরে ক্রোধ সৃষ্টি হয়।

যদি এমন না করা হয় তবে, ফেতনা হবে। অন্তরের গরমীর কারণে ফেতনা হয় যখন ফেতনা খাড়া হয় তখন আর কাজ হয় না। এটাই সবচেয়ে বড় ক্ষতি।

মসনুন দোওয়ার মধ্যে এই দোওয়া এসেছে, "হে আল্লাহ আমাদের গোনাহ মাফ করেন, অন্তরের গরমীকে দূর করে দেন এবং গোমরাহীকে দূর করে দেন এবং গোমরাহীতে ফেলে দেয় এমন ফেতনা থেকে আমাকে বাঁচান।" এই তরতীবে দোওয়া করা। এটা আপোষের

এজতে মাইয়েতের মধ্যে বহুত জুরুরী। কেউ যেন বে-উসুলী না করে এবং ভুল হলে স্বীকার করে যে ভাই আমারই ভুল। তো সে সবার মাহবুব হয়ে যাবে। ভুল হবে আর ভুল হওয়াই মানুষের বৈশিষ্ট্য। ভুল হলে মানুষ নীচে নেমে যায় না। গোহান করলে মানুষ নীচে নেমে যায় না বরং গোনাহের উপর জবরদস্তী করলে মানুষ নীচে নেমে যায়। গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দেন। ইবাদতের দ্বারাও গোনাহ মাফ হয়ে যায়। গোনাহ তো হবেই কিন্তু নিজের গোনাহের উপর দৃঢ় থাকবে না, যেমন শয়তান নিজের কথার উপরে দৃঢ় ছিল যে, আমি আদম হতে ভাল, আমার রায়ও ঠিক। শয়তান আল্লাহকে মানল না এবং আাদম (আঃ) এরও কদর করল না এটা আমাদের মাঝে চলবে না। এ জন্য মাসনুন দোওয়া করা চাই, হে আল্লাহ আমার গোনাহ মাফ করে দেন, অন্তরের গরমী অর্থাৎ কিনা দূর করে দেন, গোমরাহীতে ফেলে দেয় এমন ফেতনা থেকে আমাকে পানাহ দেন। এই তরতীবওয়ার দোওয়া করতে হবে। কারণ এগুলো এই ভাবেই হয়। বে-উসুলি হতে গোনাহ হয়, অন্তরে কিনা অর্থাৎ গরমী সৃষ্টি হয় বা গোমরাহীতে ফেলে দেয়। রসুলুল্লাহ (সঃ) আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) কে এক রেওয়ায়েতে যা বলেছেন তার কিছু অংশ বিশেষ এই যে, "তোমরা অন্তরকে সাফ রাখো মানুষের তরফ হতে, এটাই আমার সুন্নত। হুজুর (সঃ) এটা পছন্দ করতেন না যে এটা হয়েছে ওটা হয়েছে।" আমি চাই যে আমার সাহাবাদের ব্যাপারে আমার অন্তর পাক থাকুক, একে অন্যের ব্যপারে অন্তর সাফ রাখা এটা নবী (সঃ) এর সুন্নত। এজন্য যদি কোন কিছু হয়ে যায় তো অন্তরকে সাফ করে দাও যে ভাই আমি মাফ করে দিয়েছি। যদি মাফ করে দাও তো নফসের গরমী শেষ হয়ে যাবে। অন্যথায় নফস গরম হয়ে যাবে এবং শয়তান সঙ্গে হয়ে যাবে। যেমন ইঞ্জিন গরম হয়ে গেছে আর ড্রাইভার এসে গেছে, তাহলে কি হবে? শয়তান তো নফসের ড্রাইভার। তাহলে শয়তান বাহির হতে আর নফস ভিতর হতে এই গাড়িকে নিয়ে যাবে গোমরাহীর উপর, সহী রাস্তা আর রাখবে না।

ইনশা-আল্লাহ যদি কাজ অল্পও থাকে তবে তা একদিন বেশি হবেই, কিন্তু যদি অন্তর ফেটে যায় বেশি কাজ হয়েও ফেটে যাবে। আর যদি কাজ অল্প হয় কিন্তু অন্তর জুড়ে মিলে থাকে যেমন জমীন জুড়ে থাকলে যে ঘাস ছোট আছে সেটা বড় হবে। কিন্তু যাব শিকড়ে আগুন লেগেছে সে তো আর বড়ই হবে না। এজন্য যেখানেই কাজ হবে সেখানেই যদি জোড় না থাকে তখন কাজ শেষ হয়ে থাকার জিনিস প্রস্তুত হযে যাবে। এজন্য আমাদের ভিতরের জোড় খুবই জরুরী। জোড় আনার তরীকা হল নিজেকে নিজে ছোট বানাও। আমিও ছোট বাকি সকলেই বড়। যে ছোট হবে আল্লাহ তাকে বড় করবেন। হাদীশ শরীফের সারমর্মে আছে যে নিজেকে আল্লাহর জন্য ছোট বানাবে আল্লাহ তাকে বড় বানাবে। যে নিজের কথা ছেড়ে দেয়, নিজেকে ছোট বানায় আল্লাহ তাকে নিজের কুদরতে ইজ্জত দিবেন। দ্বীনের সব কাজে নিজেকে ছোট বানাও, নিজে ছোট হও, নিজেকে নরম বানাও, আল্লাহ তো নবীকে নরম বানিয়েছেন।

আল্লাহতায়ালা বলেছেন যার সারমর্ম, "হে আমার নবী (সঃ) আপনি নরম সেজন্য সকল লোক আপনার সাথে জুড়ে আছে যদি আপনি কঠিন হৃদয়ওয়ালা হতেন তাহলে আপনা থেকে সকলে দূরে সরে যেত।

ভাই আমার কথা তো শেষ করতে হবে তাই এই সমস্ত জিনিস তৈরী করা ও অন্তরকে সাফ রাখা খুবই দরকার। হজরত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) বলেছেন, ভাল জিনিস দেখো এবং কদর করো। যদি অন্তরে কদর থাকে তবে লোকেরা যে বড় বড় আমল করবে, যা আমি করতে পারব না, তখন আল্লাহ আমাকে ঐ সমস্ত আমলের সওয়াব দেবেন। এক সাথী বেশি কাজ করতে পারে, আমি তার কদর করি। আমার মাঝে তো এত যোগ্যতা নেই তাই আমি তার কদর করব, তার জন্য দোওয়া করব তাহলে যতটুকু আল্লাহ তাকে দেবেন ততটুকু আল্লাহ আমাকেও দেবেন, ইহাই হাদীসের সারমর্ম।

মোহাজিরিনগন আনসারদের ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (সঃ) এর দরাবারে আরজ করলেন, আনসাররো তো সব ফজিলত কামিয়ে নিলেন, আমরা এসেছি তাহারা আমাদেরকে ঘর দিলেন, ঘর জমি সব দিয়েছেন, তারা আপনারও খেদমতও করেছেন আবার আল্লাহর ফজলে তাদের সংখ্যায় বেশি, তাদের সব কিছুই বেশি।

হুজুর (সঃ) ফরমাইলেন, যাহারা সারমর্ম এই যে, তোমারাও দুটি কাজ কর, তবে তোমাদেরও ঐ জিনিস মিলবে।

১। তোমরা এদের কদর করো ও প্রশংসা কর। এটা নয় যে জ্বলে উঠে এদের পদমর্যদা কমিয়ে দাও, এটা করা হারাম। তাদের প্রশংসা কর, তাদের কদর কর, তাদের জন্য দোওয়া কর। যদি এমন কর তবে আল্লাহ তাদেরকে যা দিচ্ছেন তোমাদেরকেও তা দেবেন, এটাই উসুলি কথা। কোনও মানুষ দ্বীনের খেদমত করছে, আমি তার কদর করি, দোওয়া করি, তবে আল্লাহতায়ালা তাকে যা দেবেন আমাকেও তা দেবেন। আমি তার জন্য দোওয়া করলাম ও সাহায্য করলাম। নবী করীম (সঃ) তার জন্য একটা বড় উসুল বলেছেন। উহা এই যে, মানুষ তো সবকাজ করতে পারবে না, কিন্তু সব কাজের সওয়াব নেওয়া চাই এবং সব কাজের অংশীদার হওয়া চাই। উম্মত যত খায়েরের কাজ করছে তাদের কদর করি, তাদেরকে ছোট বানাই না। তাদের জন্য দোওয়া করি যে আল্লাহ তাদের পুরস্কার দেন, তাদের কাজে বরকত দেন ইত্যাদি। তবে আমরা ঐ সমস্ত কাজে অংশীদার হয়ে যাবে তো কদর করা এবং দোওয়া করা এর দ্বারা সব কাজে, শিরকত হয়ে যাবে। এজন্য ভাই আমাদের বনেদকে সহি করা চাই। যে কাজের বনেদ সহি হবে সে কাজ চলতে থাকবে। মিলে মিশে মাশওয়ারাহ করে চলি, রায় দাও, রায় নাও, রায় জিজ্ঞাসা কর, রায় বলো, অন্তরকে খোলা রাখ, অন্তর কে পরিস্কার রাখো। অন্তর খোলা থাকলে রায় নেওয়া দেওয়া চলবে নতুবা রায় নেওয়া দেওয়ার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

মাশওয়ারাহ-র মাধ্যমে অন্তর জুড়বে, সাথীর যোগ্যতাও বাড়বে, দিলে কদর থাকবে।

মানার পরিবেশ বানাও। মাশওয়ারাহর সাথে চল। এতাতের সাথে অর্থাৎ মানার মেজাজ নিয়ে চল। ইহাই হল এই কাজের বুনিয়াদ। আর তৃতীয় কথা উসুলের সাথে চল, বে-উসুলি না করি। কাজের যা উসুল বলা হয়েছে তা মেনে চলি। কোন বে-উসুলি হলে তা আপোষে মোজাকেরা করি। এমতেরাজ করব না। একে অপরকে এমতেরাজ করব না। এমতেরাজ করা হারাম। মুজাকারার দ্বারা তরতীব ঠিক হবে এবং কোরবানী বাড়িয়ে বাড়িযে চলি। এতাতেরা সাথে চলা অর্থাৎ মানা মেজাজ নিয়ে চলা, আর কোরবানীকে বাড়িয়ে যাওয়া। এগুলি খুব জরুরী। এই মোবারক কাজ করার জন্য পরস্পরের জোড় একান্ত জরুরী। আপ নিজেকে ধোঁকা থেকে বার করি। ধোঁকা থেকে কেমন করে বের হবে? তবলীগের ধোঁকা হচ্ছে এটাই যে নিজে তো কাজই করে না আর ভাবছে খুব কাজ করছি, এটা সব থেকে বড় ধোঁকা, এজন্য নিজের তরতীব কায়েম কর যাতে সহি ভাবে সময় লাগে, সহি মেজাজ হয়, আর নিজের তরতীবের সাথে মানুষকে কাজে জোড়া, মসজিদওয়ারা জামাতের ব্যাপারে যে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে তা পুরোপুরি পা বন্দী করা। নিজের ঘরে তালীম কর। নিজের ঘরে বিবি বাচ্চার সাথে নরম হও, তবেই ঘরে তালীম হবে। যদি তাদের সাথে ঝগড়া কর তবে ঘরে তালীম হবে না। নরম এর সাথে বিবি বাচ্চাদের জোড়। গরম হলে তারা দূরে সারে যাবে।

–ঃ নিজের সময় দেওয়ার তরতীব ঃ–

ঘরের তালীম মসজিদের তালীম, নিজ মহল্লায় গাসত, অন্য মহল্লায় গাসত, যাতে অন্য মহল্লায় কাজ চালু হয়ে যায়, প্রতি বৎসর ওয়াক্ত ঠিকমত লাগাও, একা নয় জামাতসহ লাগাও। দাওয়াত দিয়ে জামাত তৈরী কর। মাশওয়ারাতে কথা রাখ যে এই জামাত আমি তৈরী করেছি। আপনাররা আমাকে এদের সাথেও পাঠাতে পারেন অথবা অন্যদের সাথেও পাঠাতে পারেন এবং এই সাথীদেরকেও আমার সাথে পাঠাতে পারেন অথবা অন্য কারও সঙ্গে না জুড়ে বরং কাজের সঙ্গে জুড়ে যাক। মেহনত করে দাওয়াত দিয়ে। লোকজনকে নিজের সাথে তৈরী কর এবং নিজের মেহনতকে মাশওয়ারাতে রাখ, তাহলে কাজ হবে পার্টি হবে না। উম্মত তৈরী হবে। প্রত্যেক সাথীর সময় দেওয়ার তরতীব বানাবে। যদি সয়ম দেওয়ার তরতীবের পা বন্দী করে তবে এই কাজের উপর দৃঢ়তা এস্তেকামাত আসবে ইন্‌শা-আল্লাহ। যদি মাশওয়ারাহ অনুযায়ী চলে তবে যত কাজ আজ সারা পৃথিবীতে হচ্ছে, যদি আমার আমল মাশওয়ারাহ মোতাবেক হয়, তখন নেক কাজের বদলা ও সওয়াব আল্লাহর আমাকে আলমী পর্যাযে দেবেন।

হ্যাঁ, যেমন এক মসজিদে কাজ হচ্ছে, জামাত গাসতে যাচ্ছে, কোন সাথীকে মাশওয়ারাহ অনুযায়ী জিকিরে বসানো হল, তার এই জিকিরে বসা যেহেতু মাশওয়ারাহ মোতাবেক হয়েছে তাই এই জিকিরে বসাটা সারা দুনিয়ায় যত কাজ হচ্ছে তার একটা অংশ হবে। মাশওয়ারাহ-র মধ্যে এতবড় খায়ের আছে। যে নিজেকে মাশওয়ারাহর তাবে বানাবে সে পুরো দুনিয়াতে হচ্ছে তার সওয়াব পাবে। হ্যাঁ এটা আলমী কাজ তাই এর সওয়াবও আলমী পর্যায়ে পাবে। যদি ভুল ভ্রান্তি হয় তবে একে অপরের নিকট মাফ চাইব। যদি আল্লাহর সাথে হয় অর্থাৎ গোনাহ, আল্লাহর না ফরমানী তবে আল্লাহর নিকট তওবা করব। তওবাকে আল্লাহ খুব পছন্দ করেন। যদি আপোষে কিছু কথা হয়, তবে অন্তরকে সাফ করে অপরকে মাফ করব। ব্যাস খতম। এর জন্য যে খায়ের দুনিয়াতে আসবে প্রথমে অন্তরে তার প্রভাব পড়বে, এরপর পরিবেশে প্রভাব পড়বে। আর আল্লাহ তো প্রথমে অন্তরকে দেখেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, হে মহম্মদ (সঃ) আমি আপনার উপরে ঐ দ্বীন দিয়েছি যা নুহ (আঃ), ইবরাহিম (আঃ), মশা (আঃ), ঈশা (আঃ) কে দিয়েছি। সেটা কি? সেটা দ্বীনকে কায়েম করা, আপোষে বিভক্ত না হওয়া, এটা

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকিদ। নিজেকে চালাব, অপরকে চালাব এই চিন্তাটা শয়তানের কাজ। না, কথা তো আল্লাহরই চলবে। আল্লাহ সকলকে চালাবেন, আমাকেও চালাবেন, নিজের তরতীবকে আগে বাড়াও। বৎসরে চিল্লা হচ্ছে, চারমাস করো। যে জিনিসটা আগে বাড়ে সেটাই বাকি থাকে। নিয়েত করুন এবং কায়েম থাকুন।

- সমাপ্তি -